৩

ছোট গল্প

আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন ছোটগল্প সাহিত্যের কনিষ্ঠতম শিল্প-আঙ্গিক যেখানে জীবনের খাংশ শৈত্মিক-রীতিতে উপস্থাপিত হয়। বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও সমৃদ্ধি অর্জনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অতুলনীয়। তিরিশের সাহিত্যিকদের মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পে সংযোজিত হয় নতুন মাত্রা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা, সম্পর্কের জটিলতা, প্রবল রাজনীতিবোধ ইত্যাদি এ-সময়ের গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ-বিভাগের পূর্বেই বর্তমান বাংলাদেশে ছোটগল্পের স্বতন্ত্র ধারার সূচনা আমরা লক্ষ করি। এ-অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন-পদ্ধতির ভিন্নতা এ-ধারা নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধিকার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ এ ভূ-খে র ছোটগল্পকে বিষয়-ভাবনা ও শিল্পরূপের দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে।

এ-ইউনিটে আপনি বাংলা ছোটগল্পের এ-ধারার সঙ্গে পরিচিত হবেন। এখানে পাঁচটি ছোটগল্প নির্বাচিত করা হয়েছে যার শিল্পরূপ ও গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করা হবে। নিম্নোক্ত বিন্যাসক্রমে ছোটগল্পসমূহ আলোচনা করা হল:

- *পাঠ-১. একরাত্রি*
- *পাঠ-২. প্রাগৈতিহাসিক*
- *পাঠ-৩. নয়নচারা*
- *পাঠ-৪. দুই মুসাফির*
- *পাঠ-৫. অপঘাত*

পাঠ-১

একরাত্রি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪১)

উদ্দেশ্য

সমগ্র পাঠটি পড়ে আপনি—

- অনামা নায়কের শৈশব জীবনের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- উনিশ শতকের বাংলাদেশে রাজনীতিমুখী তরুণের অবাস্তব স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উনিশ শতকে কলকাতা-কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় দিতে পারবেন।
- গল্পের অনামা নায়কের চরিত্র বিশেষণ করতে পারবেন।
- গল্পটির শিল্পমূল্য নিরূপণ করতে পারবেন।

লেখক পরিচিতি

ইউনিট ২-এর পাঠ-২ দ্রষ্টব্য।

পাঠ-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের মধ্যে 'একরাত্রি' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একটি নিটোল ও সর্বাঙ্গসুন্দর ছোটগল্পের দৃষ্টান্ত হিসেবে 'একরাত্রি' গল্পের নামোলেখে বাঙালি সমালোচকবৃন্দ কুণ্ঠাহীন। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ' ছোটগল্প' শীর্ষক রবীন্দ্র গল্পগ্রন্থে এটি প্রথম গ্রন্থিত হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মজুমদার এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত 'গল্পগুচ্ছ: প্রথম খন্ড' গ্রন্থেও এটি সংকলন করা হয়েছিলো। ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ প্রকাশিত ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত 'গল্পগুচ্ছে'র দ্বিতীয় ভাগে (১৯০৮) 'একরাত্রি' গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে তিন খন্ডে পরিকল্পিত বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম খন্ডেই (১৯২৬) 'একরাত্রি' সংকলিত হয়েছে।

উনিশ শতকে রচিত রবীন্দ্রনাথের সব গল্পই সাধুভাষায় বিন্যস্ত। 'একরাত্রি' গল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। ভাষারীতিগত অভিন্নতা সত্ত্বেও, উনিশ শতকে লেখা গল্পগুলির মধ্যে উপস্থাপনা কৌশলের স্বাতন্ত্র্যে 'একরাত্রি' বিশিষ্ট। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি গল্পে 'আমি' বা উত্তম পুরুষের ভাষ্য ব্যবহার করেছিলেন। 'একরাত্রি' গল্পের অনামা নায়ক নিজের জীবনকথা নিজে উপস্থাপন করেছে। ফলে গল্পোক্ত সকল ঘটনা ও চরিত্র তার রুচি-বিশ্বাস ও বোধ সাপেক্ষে অভিব্যক্তি পেয়েছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এ ধরনের উপস্থাপনায় গল্পোক্ত বিষয়ের সঙ্গে গল্পস্রষ্টার দূরত্ব বজায় থাকে। 'একরাত্রি' গল্পে আত্মভাষ্যে উপস্থাপিত হয়েছে অনামা-নায়কের জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস। গল্পের শেষে মহাদুর্যোগের এক বিশেষ রাত্রিকে সে যে তার জীবনে 'অনন্তরাত্রির উদয়' বা 'তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা' রূপে গ্রহণ করলো — তা যে ব্যর্থ জীবনের গানিকে ভোলার জন্য এক আত্মপ্রতারণামূলক সান্ত্বনা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ব্যর্থতার গানিকে সান্ত্বনার প্রলেপে আবৃত রেখে অনাগত ভবিষ্যৎ যাপনার বেদনাময় প্রস্তুতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই ব্যর্থ নায়কের জীবনমুখিতা।

মূলপাঠ

সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।"

ছোটো ছিলাম, কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না — আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই জন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ

ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টর সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল — কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেড্‌ক্লার্ক হইব, ইহা আমি মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন — নানা উপলক্ষে মাছ-তরকারিটা টাকাটা-সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল; এইজন্য আদালতের ছোটো কর্মচারী এমন কি পেয়াদাগুলোকে পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইঁহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা; তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশি; সুতরাং পূর্বে গণেশের যাহা-কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইঁহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথানিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে, আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না। কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, কলিকাতার ইঁচড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করতে শিখি নাই; সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর-রৌদ্রে টো-টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এই-সব লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙাল বলিত।

নাজির-সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্‌যোগী হইলেন।

আমি পনেরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি, তখন সুরবালার বয়স আট; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এ দিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব — বাপকে বলিলাম, বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এন্ট্রেন্স্ পাস করিয়াছি, ফাস্ট্ আর্টস্ দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই; মাতা এবং দুটি ভগিনী আছেন। সুতরাং কলেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোটো শহরে এন্ট্রেন্স্ স্কুলের সেকেন্ড মাষ্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেড্‌মাস্টার রাগ করে। মাস-দুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে লেজ-মলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটি-ভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় এক-পেট জাব্‌না খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে; লম্ফে ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাস্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মানুষ, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড়ো আটচালার সংলগ্ন একটি চালায় আমি বাস করিতাম।

স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে একটি বড়ো পুষ্করিণীর ধারে। চারি দিকে সুপারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুলগৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিম গাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উলেখ করি নাই এবং এতদিন উলেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অনতিদূরে। এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী — আমার বাল্যসখী সুরবালা — ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচন বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল তাহা রামলোচনবাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা যে কোনো কালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনো রূপে জড়িত ছিল, সে কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাবুর বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক -দেড়েক অনর্গল শখের দুঃখ করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ মনে পড়িয়া গেল — বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পলব, স্থিরস্নিদ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিন্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টিরস্নারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি, যাহা করি, কিছুতেই মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোর সে সুরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্‌-না, সুরবালা আমার কে।

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।

এ কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখভাগিনী হইতে পারিত — সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত, কেবল গোটা-দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর-সকলের নিকট হইতে এক মুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লাইয়া গেল!

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুরবেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন্‌গুন্‌ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ-ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিম গাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত — কী ইচ্ছা করিত জানি না — এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ভারতবর্ষের এই-সমস্ত ভাবী আশাস্পদ-দিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিকিত না, অথচ কোনো ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত। সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি-নারিকেলের অর্থহীন মর্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে

ভাবিতাম, মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

তোমার মতো লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত; তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবাল্‌ডি, এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার! আর, রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোনো জরুরি আবশ্যক ছিল না; বিবাহের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশঙ্করীও তেমন; সেই কিনা কিছুমাত্র না ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া, সরকারি উকিল হইয়া দিব্য পাঁচ টাকা রোজগার করিতেছে — যেদিন দুধে ধোঁওয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকানপরা, কোনো অসন্তোষ নাই; পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।

রামলোচন একটা বড়ো মোকদ্দমায় কিছুকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সেদিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে, সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেড্‌মাস্টার সকাল-সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খন্ড খন্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা বৃথা। মনে পড়িল, এই দুর্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রি যাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল — সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের পুষ্করিণীর পাড় — সে পর্যন্ত যাইতে না যাইতে আমার হাঁটুজল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর-একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমাদের পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে। পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম বিপরীত দিক হইতে আর একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর-সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে, কেবল হাত-পাঁচ-ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে — তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না — কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন্‌-এক জন্মান্তর, কোন্‌-এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্য-চন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর, আজ কত দিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ংকর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে — এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে, বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্র গৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল — ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল — সুরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্‌ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড্ মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল — আমার আয়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

(জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯)

◆ ◆

টীকা

সিদ্ধিদাতা গণেশ — শিব ও দুর্গার জ্যেষ্ঠপুত্র। অভীষ্ট পূরণ করেন বলে ভারতীয় পুরাণে ইনি সিদ্ধিদাতা অভিধায় পরিচিত।

বাঙাল — পূর্ববঙ্গবাসী। বিদ্রূপার্থে গ্রাম্য লোক।

মাটসীনি — জুসেপ্পে মাৎসিনি (১৮০৫-৭২)। ইতালির বরেণ্য জননেতা। ইতালির জেনোয়া শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে 'কারবোনারি' নামের একটি গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সদস্য ছিলেন। পরে ইতালীয়দের রাজনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠন করেন 'তরুণ ইতালি' নামের জগদ্বিখ্যাত দল। প্রজাতান্ত্রিক ইতালি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মাৎসিনিকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে নির্বাসন কাটাতে হয়। ১৮৪৯ সনে রোমে তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও দ্রুত ঐ প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। মাৎসিনির রাজনৈতিক আদর্শ সমগ্র ইউরোপের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেও ইতালিতে তাঁর মতাদর্শের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে জুসেপ্পে গারিবালডি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

গারিবালডি — জুসেপ্পে গারিবালডি (১৮০৭-৮২)। মাৎসিনির মতাদর্শের অনুসারী জুসেপ্পে গারিবালডি ছিলেন ইতালির দেশপ্রেমিক নেতা ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা। সালেনিস-এর এক ধীবর পরিবারের সন্তান গারিবালডি ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মাৎসিনির 'তরুণ ইতালি' দলের সদস্য হন। রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে তিনিও দেশ থেকে নির্বাসিত হন এবং ইউরোপের ফ্রান্স ও দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়েতে বসবাস করেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মাৎসিনির নেতৃত্বাধীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর পর তাকে পলাতক জীবন বেছে নিতে হয়। ১৮৫৯ সনের বিপবের প্রাক্কালে তিনি আবার প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং সিসিলির স্বাধীনতা সংগ্রামে 'লালকুর্তা' (Red Shirts) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে অংশ নেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সিসিলি স্বাধীন হলে তিনি নেপল্‌সে চলে আসেন এবং রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসকে বিতাড়িত করে নেপল্‌স অধিকার করেন। গারিবালডির স্বপ্ন ছিলো পোপকে পরাজিত করে রোমের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা। দুবার তিনি এককভাবে রোম জয়ের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তবে তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'ইতালিয়দের ইতালি' প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক ইতালির অন্যতম স্বপ্ন দ্রষ্টা গারিবালডির স্বপ্ন সফল হয়।

পতিত ভারত — উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ভারত; পরাধীন ভারত।

এন্‌ট্রেন্স — প্রবেশিকা পরীক্ষা; ব্রিটিশ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা।

নওয়াখালি বিভাগ — অবিভক্ত বাংলার একটি প্রশাসনিক বিভাগ। 'হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল — সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে।' — গল্পের শেষাংশের স্থানিক পটভূমি নওয়াখালি বিভাগের একটি পাড়া গাঁ। নওয়াখালি বিভাগ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল। এখানে বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসকে বোঝানো হয়েছে।

বস্তুসংক্ষেপ

গল্পের কথক অনামা-নায়ক পূর্ববাংলার পাড়াগাঁয়ের ছেলে। তার শৈশবের খেলার সঙ্গী ছিলো সুরবালা। দুজনে একত্রে পাঠশালায় গিয়েছে, কখনো 'বউ বউ' খেলা করেছে। উভয়পক্ষের অভিভাবকরাও এ দুজনের শৈশবলীলার মধ্যে ভাবীকালের মধুময় পরিণতির সম্ভাব্যতা সঙ্গোপনে লালন করেছেন।

বয়স বেশি না হলেও অভিভাবকদের আলাপচারিতা ও মন্তব্যের অর্থ অনুধাবনের সামর্থ্য ছিলো গত্মকথকের। সম্ভবত এ কারণেই সর্বসাধারণের অপেক্ষা সুরবালার প্রতি তার দাবি ও অধিকার যে সুনির্ধারিত এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো মনে। ফলে যথেচ্ছ শাসন ও উপদ্রব সুরবালার ওপর আরোপ করতে সে ছিলো অকুণ্ঠিত। তার ধারণা ছিলো তার প্রভুত্ব স্বীকার করবার জন্যই পিতৃগৃহে সুরবালার জন্ম হয়েছে।

নায়কের পিতা ছিলেন চৌধুরী-জমিদারের নায়েব। তাঁর ইচ্ছা ছিলো ছেলেকেও তিনি জমিদারি সেরেস্তায় বসিয়ে গোমস্তাগিরিতে ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্খী নায়কের এতে সায় ছিলো না। গ্রামেরই এক যুবক নীলরতন যেভাবে ভাগ্যান্বেষণে গ্রাম-পালিয়ে ক্রমে কালেক্টর সাহেবের নাজির হয়েছে, সেরকমই, না-হয় অন্তত জজ-আদালতের হেডকেরানি হওয়ার স্বপ্ন ছিলো তার। ফলে নীলরতনের দৃষ্টান্ত শিরোধার্য করে একদিন পালিযে গেলো সে কলকাতায়। কলকাতায় পালিয়ে আসার সময়ে সুরবালার বয়স ছিলো আট, আর তার পনেরো।

অনামা এই নায়ক কলকাতায় এসেছিলো নাজির-সেরেস্তাদার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু রাজনৈতিক জগতের সংস্পর্শে এসে মাট্‌সীনি-গারবালডি হওয়ার আয়োজনে বিভোর হয়ে উঠলো সে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশিষ্ট হয়ে পরাধীন ভারতের উদ্ধার কর্মে আত্মনিয়োগ করলো। এ-সময়ে গ্রামে সুরবালা ও তার পিতা একমত হয়ে দুজনের বিবাহের জন্য উদ্যোগী হলেন, এ-সংবাদ যখন নায়কের কাছে এলো — তখন নায়কটি দেশোদ্ধারের মন্ত্রে পূর্ণরূপে উজ্জীবিত, আজীবন বিয়ে না করে দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফলে পিতাকে সে নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিলো যে বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ না করে সে বিয়ে করবে না।

ইতোমধ্যে উকিল রামলোচন বাবুর সঙ্গে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়ে গেলো সুরবালার। এ সংবাদ পরে যখন নায়কের কাছে পৌঁছালো তখন সে 'পতিত ভারতের চাঁদা আদায়কার্যে ব্যস্ত', ফলে এ সংবাদ নিতান্ত তুচ্ছ বলেই তার কাছে মনে হলো।

কিন্তু অচিরেই রূঢ় জীবন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো নায়কটিকে। পূর্বেই এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলো সে। কিন্তু ফাস্ট আর্টস্ পরীক্ষার প্রাক্কালে অকালে পিতৃবিয়োগ ঘটল তার। বিধবা মা আর অনূঢ়া বোনের দায়িত্ব বর্তালো তার উপর। বাধ্য হয়ে কলেজ পরিত্যাগ করে কাজের সন্ধানে বেরুতে হলো তাকে। অনেক চেষ্টায় চাকুরি জুটল নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট শহরের এন্‌ট্রেন্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারির পদে।

নায়কের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো স্কুলের আটচালা ঘরের একটি চালায়। আর স্কুল ঘরটির অনতিদূরেই ছিলো সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা। নায়কের জানা ছিলো যে, রামলোচনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, অতিপরিচিত বাল্যসঙ্গিনী সুরবালাও অবস্থান করে। ক্রমে রামলোচন বাবুর সঙ্গে আলাপও হলো তার। কিন্তু সুরবালার সঙ্গে নিজের পূর্বপরিচয়ের কথা উত্থাপন করা অসঙ্গত বিবেচনা করে রামলোচন বাবুর কাছে ঐ বিষয়ে নীরব রইলো সে। এমন একটি আত্মপ্রতারণামূলক উপলব্ধিতে উপনীত হলো সে যেন তার জীবনের সঙ্গে সুরবালা কখনোই জড়িত ছিলো না, সুরবালার কথা যেন তার স্মৃতিপটে ভালো করে উদয়ই হয় না।

একদিন রামলোচন বাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায় গত্মকথক এই নায়ক। বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে পাশের ঘরে চুড়ির মৃদু টুংটাং শব্দ, 'কাপড়ের একটুখানি খসখস' ধ্বনি ও একটুখানি পদশব্দ নায়কের অন্তর্জগতে আলোড়ন তোলে। সে অনুভব করে জানালার ফাঁক দিয়ে কোনো কৌতূহলপূর্ণ চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে। সাথে সাথেই নায়কের স্মৃতিপটে জেগে ওঠে 'বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশব প্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পলব, স্থিরস্নিদ্ধ দৃষ্টি'। রোম্যানটিক বেদনায় আপুত হয়ে ওঠে সে। বাসায় ফিরে এসেও অচরিতার্থতাজাত এক ধরনের বিষন্নতা আকড়ে থাকে তাকে। তার মনে হয়, যে সুরবালাকে সে একদিন ইচ্ছে করলেই পেতে পারতো। এখন মাথা খুঁড়ে মরলেও এক বার চোখে দেখার অধিকারটুকুও সে পাবে না। শৈশবের খেলার সঙ্গিনী সুরবালা তার যত কাছেই থাকুক মধ্যখানে স্থিত একটি বৃহৎ দেয়াল দুজনের অনতিক্রম্য দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। আত্মসান্ত্বনার বশবর্তী হয়ে নায়ক ভাবে সুরবালা তার কে! কিন্তু পরক্ষণেই মনস্তাপদীর্ণ বেদনায় সে উপলব্ধি করে যে, সুরবালা আজ তার কেউ নয় সত্য, কিন্তু সুরবালা তার এই ছিন্নভিন্ন জীবনে কী না হতে পারত!

দিনটি ছিলো সোমবার। রামলোচন মোকদ্দমা উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছেন। সেদিন স্কুলঘরে নায়ক যেমন একা ছিলো, সম্ভবত নিজের ঘরে সুরবালাও তেমনি একা ছিলো। সকাল থেকেই আবহাওয়া ছিলো আর্দ্র। আকাশের অবস্থা দেখে হেডমাস্টার সকাল সকাল স্কুল ছুটি দিয়ে দিলেন। সমস্ত দিন ধরে আকাশে খন্ড খন্ড কালো মেঘের আনাগোনায় একটা মহা আয়োজনের প্রস্তুতি চললো। পরদিন বিকেল থেকে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড়। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ও ঝড়ের বেগ বেড়ে চললো ক্রমশ। এই দুর্যোগময় রাতে ঘুমানোর চেষ্টা বৃথা। নায়কের মনে পড়লো — এই আপৎকালে সুরবালাও তার ঘরে একা আছে। স্কুল ঘরটি যেহেতু অপেক্ষাকৃতভাবে মজবুত, সেজন্য একবার তার মনে হলো সুরবালাকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়ে সে পুষ্করিণীর পাড়ে রাত্রি যাপন করবে। কিন্তু মন স্থির করতে পারছিলো না সে কিছুতেই। কিন্তু রাত একটা-দেড়টার সময় উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের সশব্দ জলোচ্ছ্বাস যখন ছুটে আসল লোকালয়ের দিকে, তখন ঘর ছেড়ে সুরবালার বাসার দিকেই ছুটলো সে। কিন্তু বানের জল এগিয়ে আসায় বেশিদূর যেতে পারলো না সে। পথেই পুষ্করিণীর পাড় — সমতল ভূমির থেকে দশ-এগারো হাত উঁচু। আশ্রয়ের জন্য পুকুরের পাড়টিতে যখন উঠলো সে, বিপরীত দিক থেকে আর একটি লোকও তখন পাড়ে উঠেছে। মুহূর্তের অনুভবময়তায় নায়কের অন্তরাত্মা,

পঞ্চেন্দ্রিয়-সমন্বিত সমগ্র সত্তা বুঝে নিল কে সেই লোক, যে এই মহাদুর্যোগে পুকুরের উঁচু পাড়টিতে আশ্রয় নিয়েছে। সুরবালাও যে নায়কটিকে শনাক্ত করতে পেরেছে এ ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ রইল না তার। চারদিক জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে। কেবল পাঁচ ছয় হাত উঁচু ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর দন্ডায়মান হতভাগ্য যুবক আর তার শৈশবের খেলার সঙ্গিনী সুরবালা। তখন প্রলয়কাল, পৃথিবীর সমস্ত আলো নির্বাপিত-প্রায়। এমনি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটি কথা বললে কিংবা কুশল-বিনিময় করলে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা ছিলো না কারো। কিন্তু দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না। অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে অন্ধকারকেই ঘনীভূত করে তুললো দুজন।

পদতলের মৃত্যুস্রোতের গর্জনের আবহে নায়কের উপলব্ধিতে জীবন্ময় হয়ে উঠলো নায়িকা সুরবালা। তার মনে হলো জন্মজন্মান্তরের রহস্যান্ধকার থেকে ভেসে এসে সুরবালা তার পাশে সংলগ্ন হয়েছে। জন্মস্রোত তাকে কাছে এনেছিলো, মৃত্যুস্রোত আবার দুজনকে একত্র করেছে। এখন একটি ঢেউ এসে অনতিক্রম্য বিচ্ছেদকে মিলনের মোহনায় একাকার করে দিতে পারে।

কিন্তু দুজনের কেউই কোন কথা বলতে পারল না, রাত্রি শেষে ঝড় থেমে গেল, জলও নেমে গেল ক্রমে। নির্বাক উভয়েই ফিরে গেল স্ব-স্ব গৃহে।

তবু এই এক অনন্তরাত্রির স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইলো বিপন্ন নায়কের অনুভবে। সে গারিবালডি হতে চেয়েছিলো; হতে পারেনি নাজির-সেরেস্তাদারও। ভাঙা স্কুলের এক অসহায় সেকেন্ড মাস্টার হয়েই ছকবাঁধা রুটিনে অতিবাহিত হবে তার অবশিষ্ট জীবন। তবু, আত্ম-অনুভবে এই স্মৃতিই তার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র সার্থকতা হিসেবে বিবেচিত হলো। এভাবেই জীবনভর ব্যর্থতার গানিকে এক আত্মপ্রবঞ্চনামূলক সান্ত্বনার প্রলেপে আবৃত করে অসহায় নায়কটি তিক্ত স্মৃতি ভারাক্রান্ত ভবিষ্যৎ জীবন-যাপনার এক বেদনাময় আত্মগুহা প্রস্তুত করে নিলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. শৈশবে সুরবালা প্রসঙ্গে অনামা নায়কের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
২. কোন্ উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে একরাত্রি গল্পের নায়ক কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিল?
৩. 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের কলকাতার রাজনীতি-সংশিষ্ট জীবনের পরিচয় দিন।
৪. উকিল রামলোচন প্রসঙ্গে গত্মকথকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।
৫. সুরবালার বিবাহিত জীবন কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল নায়কের মনে?
৬. জীবনের কোন্ রূঢ় বাস্তবতার শিকার হয়ে 'একরাত্রি'র নায়ককে এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারির পদ গ্রহণ করতে হয়েছিল?

৪নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

উকিল রামলোচন রায়ের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার সময়ে গল্পের উচ্চাকাঙ্ক্ষী নায়ক কলকাতায় রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে সংশিষ্ট থেকে পতিত পরাধীন ভারতের চাঁদা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। ফলে বৃহত্তর কর্তব্য পালনকালে সুরবালার

বিয়ের খবর অত্যন্ত তুচ্ছ বলেই মনে হয়েছিল নায়কের। সুরবালার জলজ্যান্ত স্বামীর অস্তিত্বও তার অন্তরে কোনো প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পারেনি তখন।

কিন্তু জীবনের রূঢ় বাস্তবতার শিকার হয়ে তাকে যখন নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোটো শহরে একটি এনট্রেন্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারির পদ গ্রহণ করতে হল, তখন থেকেই রামলোচন রায় নায়কের ঈর্ষাতপ্ত হৃদয়ের কারণ হয়ে উঠল। যে স্কুল ঘরটিতে থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল তার, এর অনতিদূরেই ছিল স্থানীয় সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা। রামলোচনের সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ হল নায়কের। কিন্তু সুরবালার সঙ্গে তার যে কোনো কালে পরিচয় ছিল তা জানানো সংগত নয় মনে করেই বিষয়টি সম্পর্কে রামলোচনের কাছে সে নীরব রইল। এ সময় থেকেই নায়কের চিত্তে তার স্বনিরূপিত একপেশে উপলব্ধিতে রামলোচন এক নীরব প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল।

রামলোচন রায়ের বাসায় যাতায়াত ছিল নায়কের। রামলোচনের সঙ্গে আলাপচারিতার অজুহাতে অন্দরবাসিনী সুরবালার স্পর্শধন্য বাসা ও সুরবালাই যে নায়কের চরম লক্ষ্য ছিল কথকের আত্মভাষ্যে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট। একদিন ছুটির দিনে রামলোচনের বৈঠকখানায় আলাপচারিতার সময় পাশের ঘর থেকে আসা চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ ও কোমল পদধ্বনি উলটপালট করে দেয় নায়কের ভাবনাজগৎ। সে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে জানালার ফাঁক দিয়ে শৈশবের সেই সুরবালার কৌত হলপূর্ণ চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে। তার মনে পড়ে যায় বিশ্বাস সরলতা আর শৈশবপ্রীতিতে স্নিগ্ধ সুরবালার সেই দৃষ্টি। কিন্তু নায়কের কাছে এ সত্যও স্পষ্ট যে, তখন যাকে ইচ্ছে করলেই পাওয়া সম্ভব ছিলো, এখন মাথা ঠুকে মরলেও তাকে চোখে দেখার অধিকারটুকুও তার নেই। এই সত্যোপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই রামলোচন গত্মকথক নায়কের উপলব্ধিতে একটি শিকারী চিলের চিত্রকল্পে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রামলোচন যে মূল রঙ্গমঞ্চের বাইরে অবস্থান করছিল, সে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে গোটাকয়েক গৎবাঁধা মন্ত্র উচ্চারণ করে আর সকলের কাছ থেকে, বিশেষত, স্বপ্নচারী নায়কের কাছ থেকে সুরবালাকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল। রামলোচন সরকারি উকিল। তার বিশেষ করে সুরবালার স্বামী হওয়াটা অনিবার্য কিংবা অত্যাবশ্যক ছিল না। বিয়ের আগ পর্যন্ত তার পক্ষে সুরবালা ও ভবশংকরীর মধ্যে কোনোভাব তফাৎ থাকার কথা নয়। অথচ নির্মম পরিহাসের মত সুরবালাই হয়েছে রামলোচনের ঘরনী। সুন্দর নিরুপদ্রব অসন্তোষশূন্য জীবন রামলোচনের। নিজের নিশ্চল হতাশাময় জীবনের তুলনায় রামলোচনের নিশ্চিন্ত জীবন ঈর্ষাপীড়িত করে নায়ককে। এক নিশ্চল প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্ব নিয়ে নায়কের মনে রামলোচন জেগে থাকে।

৫ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

শৈশবে খেলার সঙ্গিনী সুরবালা সম্পর্কে গল্পের নায়কের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, সর্বসাধারণের অপেক্ষা তার দাবিই সুরবালার ওপর সর্বাধিক। এ ধারণার সূত্রেই নায়কটির জানা হয়ে গিয়েছিল যে, তার প্রভুত্ব স্বীকার করার জন্যই সুরবালা নিজের পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেছে।

কিন্তু কলকাতা জীবনের রাজনৈতিক ডামাডোলে বিভ্রান্ত নায়কের কাছে পতিত ভারতের তুলনায় সুরবালা নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে ওঠে। ফলত সুরবালার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করে সে। পরে ভাগ্য বিড়ম্বিত নায়ক রূঢ় বাস্তবতার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নওয়াখালি বিভাগের একটি শহরে এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারির পদগ্রহণ করে অনেক চেষ্টা-তদ্বিরের ফলে। এখানেই সরকারি উকিল রামলোচনকে নিয়ে সুরবালার সুখের সংসার নায়কের মনে শৈশবের স্মৃতিময় জগৎকে জাগিয়ে তোলে। শৈশবের যে সুরবালা ছিল নিতান্তই তুচ্ছ, বিবাহিত জীবনের সেই সুরবালাই এ-পর্যায়ে পরিণত হয় তার মনোবিশ্বের মানসীতে। শৈশবের লীলাচাপল্য-নিবিড় জীবনের অভ্যন্তরে যে সম্ভাবনা নিহিত ছিল, সময়ের ফেরে তাকে অগ্রাহ্য করে বিভ্রান্ত ও বিপন্ন নায়ক আজ এক রিক্তজন।

সুরবালার স্বামী সরকারি উকিল রামলোচনের বৈঠকখানায় যাতায়াত ছিল নায়কটির। একদিন বৈঠকখানায় রামলোচনের সঙ্গে আলাপচারিতার কালে পাশের ঘরে চুড়ির মৃদু টুংটাং, কাপড়ের খস্‌খস্‌ শব্দ এবং মৃদু পদধ্বনি আলোড়ন তোলে নায়কের মনোলোকে। মুহূর্তের মধ্যেই সরলতা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ সুরবালার শৈশব-প্রতিমা তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। পরে নিজের ঘরে ফিরে নায়কটি এই নির্মম উপলব্ধিতে উপনীত হয় যে, একদিন যাকে ইচ্ছে করলেই নিজের করে পাওয়া যেত, এখন মাথা কুটে মরলেও তাকে চাক্ষুষ করার অধিকারটুকু তার নেই। রামলোচনকে কেন্দ্র করে সুরবালার সুখের সংসার ক্রমশ তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে সূক্ষ্ম ঈর্ষা। শিকারী চিলের চিত্রকল্পে রামলোচন যেন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সর্ব ঘটনা থেকে বাইরে অবস্থানকারী রামলোচন হঠাৎ উপস্থিত হয়ে কয়েকটা গৎবাঁধা মন্ত্রপাঠ করে তার সুরবলাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বিয়ের পূর্বে রামলোচনের কাছে সুরবালাও যা, ভবশংকরীও তাই। তবে এ-সব ভাবনার বিপরীতে বর্তমানে সুরবালা যে একান্ত ভাবেই রামলোচনের, এই তিক্ত সত্য অস্বীকার করার উপায় থাকে না নায়কটির। ফলত, সুরবালা-রামলোচনের সুখময় দাম্পত্য-জীবনের তুলনায় নিজের ব্যর্থজীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে দীর্ণ-বেদনায় পুনরাবিষ্কার করে নায়কটি।

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।
২. নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাটসীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।
৩. সহসা হৃৎপিন্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্ঠিরন্নারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল।
৪. মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

২ নং ব্যাখ্যার নমুনা- উত্তরঃ

আলোচ্য গদ্যাংশটুকু বাংলা ছোটগল্প রচনার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'একরাত্রি' গল্প থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

উদ্ধৃত অংশে গল্প-নায়কের আত্মভাষ্যে বিবৃত হয়েছে তার জীবনের এক বিশেষ প্রসঙ্গ, যা তাকে বিভ্রান্ত করে বেদনাময় পরিণতির দিকে আকর্ষণ করেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী নায়কের অচরিতার্থ জীবনের আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য গদ্যাংশে।

গ্রামীণ সামন্ত সমাজ পরিএন্ডলে বেড়ে ওঠা গল্পের নায়ক শৈশব থেকেই উচ্চাভিলাষী। তার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। স্বভাবতই পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্রকে কোথাও একটা গোমস্তার কাজে ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী নায়কের এতে সম্মতি ছিল না। তাদের পাড়ার নীলরতন যে- ভাবে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখে কালেক্টর সাহেবের নাজির হয়েছে, ঠিক সে রকম না হলেও উচ্চ লক্ষ্য নিয়েই সে কলকাতায় পালিয়ে গিয়েছিল। কালেক্টর সাহেবের নাজির না হতে পারলেও জজ-আদালতের হেড-কেরানি হওয়া যে যাবেই — এ ব্যাপারে স্থির প্রত্যয় ছিল তার।

কিন্তু উনিশ শতকের ন'য়ের দশকের শেষ দিকে কলকাতার রাজনৈতিক জীবনের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যুবকটি। পতিত ও পরাধীন ভারতের উদ্ধার কাজে জড়িয়ে তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে জন্ম নিল রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। কালেক্টর সাহেবের নাজির না হলেও, অন্তত জজ-আদালতের হেড-কেরানি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম পালিয়ে যে যুবক মহানগরীতে এসেছিল, রাজনৈতিক জগতের সংস্রব তাকে তার অকিঞ্চিৎকর স্বপ্নলোক থেকে অত্যP এক কল্পনার রাজ্যে টেনে নিল। নাজির বা হেড-কেরানি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় আগত নায়কটি স্বপ্ন দেখল ইতালির জাতীয়তাবাদী নেতা জুসেপ্পে মাৎসিনি ও জুসেপ্পে গারিবালডি হওয়ার।

নিজের অবস্থানের সঙ্গে প্রত্যাশার অবাস্তব ভারসাম্যহীনতাই নায়কটির বেদনাময় অনিবার্য পরিণতির পরিপ্রেক্ষিত প্রস্তুত করেছে। তার রাজনৈতিক উচ্চভিলাষ রূঢ় বাস্তবের পীড়নে বিপর্যস্ত তো হয়েছেই, তার নিভৃত ব্যক্তিজীবনও অচরিতার্থতার বেদনায় হয়েছে সংরক্ত।

৪ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ

উদ্ধৃত গদ্যাংশটুকু বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়িত হয়েছে।

আলোচ্য অংশে গল্পের অনামা নায়কের আত্মভাষ্যে তার বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

ছাত্রজীবনে কলকাতার রাজনৈতিক ডামাডোলে জড়িয়ে পড়ে শৈশবের সঙ্গিনী সুরবালাকে বিস্মৃত হয়েছিল নায়ক। নায়কের পিতা আর সুরবালার পিতা একমত হয়ে যখন বিয়ের জন্য উদ্‌যোগী হলেন, তখন দেশব্রতে নিবেদিত-প্রাণ নায়ক বিদ্যাভ্যাসের অজুহাত দেখিয়ে বিয়ের ব্যাপারে নিজের অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ইতোমধ্যে উকিল রামলোচনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় সুরবালার। বিয়ের সংবাদটি যখন নায়কের কাছে পৌঁছায় তখন সে পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত। ফলে, সংবাদটি তার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ বলেই গণ্য হয়।

উত্তরকালে বাধ্য হয়েই নওয়াখালি বিভাগের একটি শহরে এন্‌ট্রেন্স স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারির পদ নায়কটিকে গ্রহণ করতে হয়। ঐ শহরেই সুরবালাকে নিয়ে সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের সুখের সংসার। রামলোচনের সঙ্গে নায়কের আলাপ হয়, তার বৈঠকখানাতেও যাতায়াত চলে যুবকটির। কিন্তু রামলোচনের কাছে সযত্নেই সে গোপন রাখে সুরবালার সঙ্গে তার শৈশবের সম্পর্কসূত্র।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনের সঙ্গে আলাপচারিতার সময়ে পাশের ঘরে চুড়ির অত্যন্ত মৃদু টুংটাং, কাপড়ের খস্‌খস্‌ শব্দ এবং একটুখানি পদধ্বনি শুনে আলোড়িত হয়ে ওঠে বিপন্ন নায়কটির চিত্তলোক। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে সে অনুভব করে জানালার ফাঁক দিয়ে কোনো কৌতূহলপূর্ণ চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে। ফলত, মুহূর্তেই নায়কের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে

শৈশবের সুরবালার বড় বড় দুখানি চোখ, কালো কালো তারা, ঘন কালো পলব — বিশ্বাস, সরলতা ও শৈশবপ্রীতিকে স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিপাত!

কিন্তু নির্মম বাস্তব এই, সুরবালা আজ পরস্ত্রী। ইচ্ছে করলেই যাকে একদিন পাওয়া সম্ভব ছিল, এখন মাথা কুটে মরলেও তাকে চাক্ষুষ করার অধিকার তার নেই। ফলে বিশেষ এক ধরনের বিসন্নতা আচ্ছন্ন করে ফেলে নায়কটিকে। নিজের বিপর্যস্ত মনটি এক বৃহৎ বোঝার মত ভার হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। বুকের শিরা ধরে এই বৃহৎ বোঝা দুলতে থাকে যেন। এই বৃহৎ বোঝার ভার বহন করার শক্তি হারিয়ে ফেলে সে। মনসমেত নিজের দেহ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নায়কটি।

আলোচ্য অংশে নিজের দেহ থেকে বিছিন্ন এক চরিত্রের মানস-সংকটের পরিচয় অভূতপূর্ব এক চিত্রকল্পের মাধ্যমে বা ময় হয়ে উঠেছে।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. 'একরাত্রি' গল্পের শিল্পমূল্য বিচার করুন।
২. 'একরাত্রি' গল্পের কথক অনামা-নায়কের চরিত্র বিশেষণ করুন।
৩. নায়ক-চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে শৈশবের সুরবালা ও উত্তরজীবনের সুরবালার তুলনা করুন।
৪. 'একরাত্রি উনিশ শতকের নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি যুবকের ব্যক্তিগত জীবনের পরাভবের কাহিনী'-আলোচনা করুন।

১ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

'একরাত্রি' উনিশ শতকে রচিত রবীন্দ্র-গল্পগুচ্ছের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এর বিষয় ও বৃত্ত, ভাষা ও বিন্যাস কৌশল এবং রসাবেদন একটি আদর্শ ছোটগল্পের বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। গল্পটির নিটোল সংহত সংগঠন এবং মহাপরিণতির লক্ষ্য-কেন্দ্রিকতা 'একরাত্রি'র শিল্পসিদ্ধির উৎস।

'বর্ষাযাপন' কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে ছোটগল্পের যে সংজ্ঞা উপস্থাপিত হয় প্রায়শ, তার নিরিখে বিশেষণ করলে 'গল্পগুচ্ছে'র অনেক গল্পই সে-সংজ্ঞার সীমা অতিক্রম করে যায়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচল সৃষ্টিশীল প্রতিভা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সংজ্ঞা নির্ভরতার শিকার হননি কখনও। প্রথম পর্বে রচিত 'একরাত্রি' এ-বক্তব্যের আদর্শ দৃষ্টান্ত। জীবনের অন্তিম-পর্বে প্রাজ্ঞ সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ 'শেষ কথা' গল্পের খসড়া 'ছোটগল্প' শীর্ষনামের রচনায় ছোটগল্পের চরম লক্ষ্য ও রসাবেদন প্রসঙ্গে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন, তার আলোকেই 'একরাত্রি' গল্পের মূল্যায়ন করা সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়। তিনি লিখেছিলেন-'মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো, তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে — সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটোগল্প।' বর্তমান গল্পটি বিশেষণ করলে, আমরা দেখতে পাই হতভাগ্য এক যুবকের অচরিতার্থ জীবনের সংহত কাহিনী উপান্তে তীব্র অথচ অনিবার্য এক নাট্যঘন মহা মুহূর্ত (Climax) প্রস্তুত করেছে যা সুফলা বনস্পতির মতই তার জীবনের অনিবার্য দৈবলব্ধ নিয়তি।

'একরাত্রি' গল্পটি নায়কের উত্তমপুরুষের ভাষ্যে উপস্থাপিত। ফলত গল্পে যাবতীয় ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া নায়কের প্রেক্ষণবিন্দু (Point of View) থেকেই বর্ণিত ও মূল্যায়িত হয়েছে। গল্পটির মহামুহূর্ত প্রসঙ্গে নায়কের উপলব্ধি ও প্রত্যয় তার নিজস্ব ধারণাজাত। ঐ উপলব্ধি ও প্রত্যয় নায়কের চেতনায় মহাসত্য রূপে পরিগণিত হলেও, পাঠককে তা নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে এমন কথা নেই। গল্পের শেষে নায়কের জীবনে যে অনন্তরাত্রির উদয় হয়েছিল, যাকে সে জীবনের 'একমাত্র চরম সার্থকতা' বলে অভিহিত করেছে, তা যে অনিঃশেষ ব্যর্থতার পটভূমিকায় আত্মপ্রতারণামূলক সান্ত্বনার প্রলেপ মাত্র এটি অনুধাবনে পাঠকের অসুবিধা হয় না। এবং এখানেই নায়কের বেদনাময় নিয়তির রসাবেদনও নিহিত।

শৈশবের সঙ্গিনী সুরবালা যে তার জন্যই পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেছে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল নায়কটির। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী নায়ক যখন কালেক্টর সাহেবের নাজির হওয়ার জন্য কলকাতায় পালিয়ে এসে রাজনৈতিক ডামাডোলে জড়িয়ে পড়ল — তখন তার উচ্চাভিলাষ অবাস্তব অভ্রভেদী লক্ষ্যে হল পথহারা। এ সময়ে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ একমত হয়ে যখন বিবাহ-অনুষ্ঠানে উদ্‌যোগী হলেন তখন দেশনায়ক হওয়ার অমিত প্রত্যাশ্যায় উদ্বেল মাঝারি মাপের মানুষ এই নায়কটির কাছে পলিবাসিনী সুরবালা কোনো আবেদনই সঞ্চার করতে পারেনি। পরে সুরবালার বিয়ের সংবাদ যখন তার কাছে পৌঁছায় তখনও ঘটনাটি অতিতুচ্ছ বলেই প্রতিভাত হয় তার কাছে।

উত্তরকালে কঠিন বাস্তবের শিকার হয়ে নায়কটিকে নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট শহরে এনট্রেন্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারির পদ গ্রহণ করতে হয় অনেক চেষ্টায়। ঐ শহরেই সুরবালাকে নিয়ে সরকারি উকিল রামলোচনের সংসার। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র উহ্য রেখেই রামলোচনের সঙ্গে আলাপ হয় নায়কটির। একদিন রামলোচনের বৈঠকখানায় আলাপচারিতার সময় পাশের ঘর থেকে চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের খস্‌খস্‌ এবং মৃদু পদশব্দ উন্মাতাল করে নায়কের মনোলোক। বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি রূপে শৈশবসঙ্গিনী সুরবালার মধুর দৃষ্টিপাত মুহূর্তেই তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। নায়ক ফিরে আসে তার আবাসে। তার চেতনায় ও জীবনযাত্রায় সূচিত হয় বিশৃঙ্খলা। ক্রমে নির্মম এই সত্য সে অনুধাবন করে যে, যাকে একদিন ইচ্ছে করলেই পাওয়া সম্ভব ছিল, এখন মাথা কুটে মরলেও তাকে চাক্ষুষ করার অধিকার বঞ্চিত সে! উপলব্ধির এই পর্যায়েই গল্পটি ক্রমশ অভিমুখী হয় মহামুহূর্তের। রামলোচন মামলার প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়েছিলো। এরই মধ্যে একদিন দেখা দেয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা। দিন শেষে রাত্রির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পাশাপাশি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সমুদ্রের তরঙ্গরাশি। উপকূল ছাপিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করে জলোচ্ছ্বাস-তাড়িত প্রবাহ। নায়ক দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে সুরবালার বাসার দিকেই রওয়ানা হয়। কিন্তু রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ায় বেশি দূর যেতে পারে না সে। আত্মরক্ষার জন্য পুকুর পাড়ের উঁচু ঢিবিতে উঠার সময়েই সে লক্ষ্য করে অপর প্রান্ত থেকে পুকুরের পাড়ে উঠে আসছে আর একটি মানুষ। দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাতেও নায়কের অনুভব করতে অসুবিধা হয় না যে, যে মানুষটি আত্মরক্ষার জন্য ঢিবিতে উঠে দাঁড়াল — সে সুরবালা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ শৈশবের সুরবালাকে আবার নায়কের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। কথা বললে হয়তো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না। রাত্রি শেষে জল নেমে গেলে দুজন নিরবে নিজেদের নীড়ে ফিরে গেল। তবু এই এক অনন্ত রাত্রির স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইলো বিপন্ন নায়কের অনুভবে। তার মনে হল এই মহামুহূর্তই তার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র সার্থকতা। আত্মপ্রতারণামূলক এই সান্ত্বনার প্রলেপে আবৃত করে নায়কটি রচনা করবে তার দুঃসহ ভবিষ্যৎ। তবু মহামুহূর্তের এই উপলব্ধিই গল্পটির চরমক্ষণ, সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষায় যাকে বলা হয় ঈষরসধী।

লক্ষণীয় 'একরাত্রি' গল্পে কোনো তত্ত্বলোকে পৌঁছানোর প্রয়াস নেন নি গত্মকার। গল্পটি আত্মভাষ্যে উপস্থাপিত হওয়ায় চরিত্র নির্মাণের অবকাশটুকুও ছিল না এতে। বরঞ্চ পরাজয়কে মেনে নেয়ার এক অত্যুচ্চ রোম্যানটিক আবেগ উচ্চকিত হয়েছে গল্পটিতে। সম্ভবত এ জন্যেই 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'একরাত্রি' কে 'কাব্যধর্মী' গল্প অভিধায় চিহ্নিত করেছেন।

'একরাত্রি' তে ঘটনা আছে কিন্তু ঘটনার ঘনঘটা নেই। সংঘটিত সব ঘটনার প্রতিক্রিয়াই নায়ক-চরিত্রের ভাবসাপেক্ষ। শৈশব থেকে কাহিনীর সূত্রপাত হওয়ায় একটা 'ন্যারেটিভ' রচনার আদল শুরুতে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু নায়কের চেতনাশাসিত অনুভবময়তার মধ্যেই শেষাবধি পরিণতি সন্ধান করেছে গল্পটি।

'একরাত্রি' কে কাব্যধর্মী গল্প হিসেবে অভিহিত করা হলেও, নায়কের শিক্ষকজীবনের আত্মভাষ্য পর্যন্ত কালপরিসরের ভাষায় আত্মশেষ ও বিদ্রূপ চরিত্রটির জীবনের ব্যর্থতাকে সংকেতিত করতে সহায়ক হয়েছে।

'একরাত্রি' গল্পে লেখকের ব্যক্তিত্বের লক্ষণীয় প্রকাশ শনাক্ত করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'মানসী-সোনারতরী' পর্বের কবিতায় অপার সৌন্দর্যলোকে মানসপ্রিয়ার সঙ্গ কবির ভাবসম্মিলনের যে আকুতি ধ্বনিত হয়েছে, 'একরাত্রি' গল্পের ভাববস্তু ঐ 'আলম্বন-উদ্দীপন'কে আশ্রয় করেই উত্তীর্ণ হয়েছে বলে তাঁর অভিমত। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেমভাবনাতেই ঐ অভিন্ন প্রেরণার অনুরণন। এই অর্থে 'একরাত্রি'র পরিণতির ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ ঘটেছে।

গল্পের সংগঠন ও নামকরণ প্রসঙ্গেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন উদ্ধৃতিযোগ্য। উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে মোক্ষম কথাটি তিনি তিনটি অমোঘ বাক্যে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন — "সমস্ত গল্পটি সনেটের মতো দৃঢ়নিবদ্ধ — প্রতীতির সমগ্রতা নিপুণভাবে রক্ষিত। আর নাম? 'একরাত্রি' ছাড়া এ গল্পের নামান্তর কল্পনাই করা চলেনা — 'Only one night — but the eternal night।"

পাঠ-২

প্রাগৈতিহাসিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯০৮-১৯৫৬)

উদ্দেশ্য

সমগ্র পাঠটি পড়ে আপনি —

- ভিখুর আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত অসংস্কৃত জীবন বর্ণনা করতে পারবেন।
- অস্তিত্ব-সংকটের পটভূমিকায় ভিখুর প্রবল জীবনানুরাগের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভিখু চরিত্র বিশেষণ করতে পারবেন।
- 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবেন।
- গল্পে বিধৃত গত্মকারের জীবনদৃষ্টি বিশেষণ করতে পারবেন।
- 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের শিল্পমূল্য বিচার করতে পারবেন।

লেখক-পরিচিতি

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা জেলার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, জননী নীরদাসুন্দরী দেবী। মানিকের পিতৃ-মাতৃ উভয় পক্ষেরই নিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। তাঁর প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার, ডাক নাম ছিল মানিক। কিন্তু লেখক-নাম 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর গ্রহণযোগ্যতার কাছে প্রবোধকুমার নামটি অন্তরালে চলে যায় এক সময়।

পিতৃপক্ষের আদি-নিবাস বাংলাদেশে হলেও সেটেলমেন্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পিতার সরকারি চাকুরির কারণেই মানিকের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় তৎকালীন পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা এবং বিহার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিব্যাপ্ত তাঁর অসমাপ্ত শিক্ষাজীবন। মানিক ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে অংক পরীক্ষায় লেটারসহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আই.এস.সি পরীক্ষা দেন বাঁকুড়ার ওয়েসলিয় মিশন কলেজ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এবং এ-পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগ লাভ করেন। এরপর মেধাবী ছাত্র মানিক অংকশাস্ত্রে অনার্সসহস্নাতক হবেন এই প্রত্যাশায় কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই তিনি সাহিত্যজগতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন নিজেকে। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে এ-সময়েই তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম গল্প 'অতসী মামী'। গল্পটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বিচিত্রা পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় ছাপা হওয়ার পর থেকেই মানিক ক্রমশ সার্বক্ষণিক লেখকে পরিণত হন। ফলত প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জন করে বিজ্ঞানী হওয়ার আশা ছাড়তে হয় তাঁকে। দুবার বি.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও কৃতকার্য হতে পারেন নি।

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস **জননী** (১৯৩৫) ও **দিবারাত্রির কাব্য** (১৯৩৫) প্রকাশিত হয়। এর অত্মকাল পরেই তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **পুতুল নাচের ইতিকথা** (১৯৩৬) ও **পদ্মানদীর মাঝি** (১৯৩৬) প্রথমে ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই চলিশের দশক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ মার্কসবাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়েন। এরই ক্রমধারায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাভ করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ। তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনায় ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ-তত্ত্ব ও নিয়তিবাদ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু পার্টি সভ্যপদ প্রাপ্তির পরের রচনাগুলিতে মুখ্যস্থান জুড়ে গেল সমাজ ও মানুষের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রেরণা। তবু শিল্পমূল্য ও রসাবেদনগত দিক থেকে প্রথম পর্যায়ের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই উজ্জ্বলতর। প্রথম পর্বে রচিত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিই বাংলা কথাসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ রূপে গৃহীত।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ময়মনসিংহ সরকারি গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রথানুগ কর্মময় জীবনে আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ সর্বদা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গশ্রী পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। কিন্তু মাত্র দুবছরের মাথায় তিনি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। অনুজ সুবোধকুমারকে নিয়ে মানিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি প্রকাশনালয়। কিন্তু এটিও স্থায়ী হয়নি। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অর্গানাইজার দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি করেন ১৯৪৩-এর জুন অবধি। পার্টি সভ্যপদ লাভের পর মুখ্যত লেখালেখি ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্যেই নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন মানিক। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নির্বাচিত হন প্রগতি

লেখক সংঘের যুগ্ম সম্পাদক-এর পদে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মানিক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর শেষ জীবন সীমাহীন অর্থকষ্ট ও মৃত্যুমুখী ব্যাধির যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত কালজয়ী কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জীবনাবসান ঘটে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প — কথাসাহিত্যের এই দুধারাতেই অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রচুর রচনা বাংলা চিরায়ত কথাসাহিত্যের সম্পদ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উলেখযোগ্য গ্রন্থ-

উপন্যাস: জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), অহিংসা (১৯৪১), চতুষ্কোণ (১৯৪২), চিহ্ন (১৯৪৭), জীয়ন্ত (১৯৫০), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫০)।

ছোটগল্প: অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮) সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪০), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)।

নাটক: ভিটেমাটি (১৯৪৬)।

কবিতা: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৭০)।

প্রবন্ধ: লেখকের কথা (১৯৫৭)।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রাগৈতিহাসিক' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির রূপায়ণ-দক্ষতা, আকাঁড়া বাস্তবতা ও পরিণতির দার্শনিকতামন্ডিত ব্যঞ্জনা গল্পটির শ্রেষ্ঠত্বের উৎস।

প্রাগৈতিহাসিক গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত এ-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল উলেখ ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক-এর প্রকাশকাল এপ্রিল ১৯৩৭ বলে গবেষকরা অনুমান করেন। প্রাগৈতিহাসিক-সহ মোট দশটি গল্প গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়। গল্পগুলি হচ্ছে-'প্রাগৈতিহাসিক', 'চোর', 'মাটির সাকী', 'যাত্রা', 'প্রকৃতি', 'ফাঁসি', 'ভূমিকম্প', 'অন্ধ', 'চাকুরী', 'মাথার রহস্য'। তবে 'মাটির সাকী' গল্পটি ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সর্বদর্শী লেখকের ভাষ্যে উপস্থাপিত 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি সাধু ভাষারীতিতে লিখিত। এখানে গত্মকারের ভূমিকা যেহেতু সর্বদর্শীর, সেহেতু গল্পের কথাবস্তুর মধ্যদিয়ে সৃজয়িতার জীবনদর্শন সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পগ্রন্থের রচনাপর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন দৃষ্টিতে অন্ধ-নিয়তিচেতনা ও ফ্রয়েডিয় লিবিডোতত্ত্বের প্রভাব ছিল। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের নায়ক ভিখুর চরিত্রে আদিম প্রবৃত্তিতাড়না, অন্ধ নিয়তির আধিপত্য বিস্তার এবং অস্তিত্বরক্ষা তথা প্রবল জীবনানুরাগ পরিস্ফুট হয়েছে। তবে গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে লেখকের ভাষ্যে পাঁচীকে কাঁধে নিয়ে ভিখুর পথযাত্রার বর্ণনায় আদিম অথচ অনিঃশেষ মানবিক প্রবৃত্তিতাড়নার নিরঙ্কুশ আধিপত্যের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

মূলপাঠ

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদীতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দল ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোচা খাইয়া পলাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথাভাঙ্গা পুলটার নীচে পৌঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরো ন'ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ী চিতলপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাও খান সহজ লয় স্যাঙ্গাৎ। উটি পাকবো। গা ফুলবো। জানাজানি হইয়া গেলে আমি ক'নে যামু? খুনটা যদি না করতিস্ — '

'তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহ্লাদ।'

'এই জনমে লা, স্যাঙ্গাৎ।'

বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিল। বলিল, 'বাদলায় বাঘটাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছে গা। সাপে যদি না কাটে ত আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু কি?'

'চিড়া-গুড় দিলাম যে? দুদিন বাদে ভাত লইয়া আসুম; রোজ আইলে মাইনষে সন্দ করব।'

কাঁধের ঘা'টা লতাপাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোন না কোন অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপ্‌সা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিত, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল, সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন-চারদিনের মত চিঁড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নেই। গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল, যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসীর জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহ্লাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসীটা লইয়া যে সে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসী জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না; অসহ্য ক্ষুধা পাইলে চিঁড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। এক হাতে ক্রমাগত পোকা ও পিপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিন্‌জুরি গাছের পাতার ফাঁকে উকি দিতে দেখিয়া পুরা দুঘণ্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া রহিল এবং তাহার পর দুএক ঘণ্টা অন্তরই চারিদিকে ঝোপে ঝপাঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুমের বাড়ী গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুম বাড়ীর বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁস হইয়া পাড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কি ভাবে দিন-রাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তাড়ির নেশার মতোই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মত ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় এক সময় জলের কলসীটা নীচে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটলির মধ্যে চিঁড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশেপাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুমবাড়ী হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য একবাটি ভাত ও কয়েকটি পুঁটিমাছ ভাজা আর একটু পুঁইচচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মই-এ শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ী লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপরে খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও একরকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভাল হইল না। গাছের মরা ডালের মত শুকাইয়া গিয়া অবশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়ীতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলেও ভিখু তাহার একটিমাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ী ছিল না, ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইয়া আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়া যাইতেছিল ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্দীর মেয়ে! দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ী ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটা বৌ এর পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে তাহার বাকী রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্তব্যই হোক সম্ভব একেবারেই নয়। ভিখু তাহার ধারাল দাটি বাঁ হাতে শক্তি করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনোখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশীল কথার আদান প্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগ্যা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইর, আমার বাড়ী থেইকা — দূর হ'।

ভিখু বলিল 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস। আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু'।

'তোর বাজুর খবর জানে কেডারে?'

'বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভাল চাস ত! বাজু না দিলি সা'বাড়ীর মেজো কত্তার মত গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম। বাজু পালি' আমি এখনি যামু গিয়া।' কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল।

পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুর রাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাগ্দীপাড়ায় বিষম হৈ চৈ বাধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিলো, হায় সর্বনাশ!'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারা ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম, অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া একটা গোল ডিঙ্গি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। একটা চ্যাপটা বাঁশকে হালের মত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোন রকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশীদূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয় ত তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধাটার কথা ভাবিবে না। পুলিশ বহু দিন যাবত তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়ীতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশেপাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দুজন যোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়াস্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের

ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্র লোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দুটো পয়সা দিবান কর্তা?'

তাহার মাথায় জটবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল কোমরে জড়ানো মাটির মত ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া, আর দড়ির মত শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকের বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল — 'একটা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন, — 'একটা দিলাম, তাতে হল না, ভাগ্।'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালই দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়িমুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতে খড়ি।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম ভিখারীর মত আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একবারেই সাফ্ করে না। মাথার চুল ক্রমেই তাহার জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন পরিবার দিনের পর দিন বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মত দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষত চিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও সে কোটটা গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন। এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি তাই সে বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ্ ও একটি লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিকটা তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে ইটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনদিন রাঁধে ছোট মাছ, কোনদিন তরকারী। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুল গাছটার নীচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাসটানা শ্বাসটানা কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায়: 'হেই বাবা একটা পয়সা : আমায় দিলে ভগবান দিবে : হেই বাবা একটা পয়সা।'

অনেক প্রাচীন বুলির মত 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' শোকটা আসলে অসত্য। সারাদিন ভিখুর সামনে দিয়ে হাজার দেড় হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশী হইলেও সারাদিন ভিখুর পাঁচ ছ'আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দুদিন হাট বসে। হাটবারে উপার্জন তাহার পুরা একটি টাকার নীচে নামে না।

এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দুতীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিন্নু মাঝির বাড়ীর পাশে ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ওইখানে শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ কিন্তু পুরু একটি কাঁথা সে সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ীর খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে গৃহস্থ বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটলি করিয়া বালিসের মত ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জলো বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশী নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবে সে এখনও ভিক্ষা চায়। কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিষ কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানীকে মারিতে ওঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরাস্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশী হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাতে স্বরচিত শয্যায় সে ছট্‌ফট্ করে।

নারী-সঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তার ভাল লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে। তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হলা করিত, টলিতে টলিতে বালীর ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখার আর সে আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কি আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া বেড়াইয়া আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে, কিন্তু জীবনে একবারের বেশী পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগ্দীর সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যে বার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাতবছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দুবছরের বেশী কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থ বাড়ীতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিন দুপুরে পুকুরঘাটে একাকিনী গৃহস্থ বধূর মুখ চাপিয়া গলার হার হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে, রাখুর বউকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালী হইয়া সমুদ্র ডিঙাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছ'মাস পরে রাখুর বউকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দায়ের এক কোপে দুফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কি জীবন তাহার ছিল, এখন কি হইয়াছে।

মানুষ খুন করিতে যাহার ভাল লাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিট্‌কারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনও তেমনি অক্ষুণ্ন আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানী হিসাব মেলায়, বিদেশ-গত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নু মাঝির চালাটার নীচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডানহাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আপ্‌সোসের সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এত বড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে। এমন কপালও মানুষের হয়?

তবুও এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আপ্‌সোসেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটা ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশী নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরেই সে ভিখুর চেয়ে বেশী রোজগার করে। সে জন্যে ঘা টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, 'ঘা'টি সারবো- না, লয়?'

ভিখারিণী বলে, 'খুব! ওসুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে, 'সারা তবে, ওসুদ দিয়ে চটপট সারাইয়া ল। ঘা'টি সারলে তোর আর ভিক্ মাগতে অইবো না, — জান্‌স? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি'ত।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু, আরামে রাখুম, পায়ের পর নি পা'টি দিয়ে গাট হইয়া বইয়া থাকবি। না করস্ তুই কিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিণী নয়। খানিকটা তামাক পাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা'টি মুই তখন পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিণী কোনমতেই রাজী হয় না। ভিখু ক্ষুণ্ন মনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ার ভাঁটা বয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশে কলাবাগানে চাঁপাকলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রূপোর গোট

কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরাল ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে আর সে সামলাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিণীর কাছে যায়; বলে, 'আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্!'

ভিখারিণী বলে, 'আগে আইবার পারো নাই? যা; অখন মর গিয়া আখার তলের ছালি খা গিয়া!'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কি?'

'তোর লাইগ্যা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি'।

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মত জোয়ান দাড়িওয়ালা এক খঞ্জ ভিখারী খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মত একটি পা' হাঁটুর নীচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্নসহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আলার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে। পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিণী আবার বলিল — 'বসস্ যে? যা পালাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইবো, কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, খুন অমন সব হালায়ই করতিছে! উয়ার মত দশটা মাইন্ষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পার্ত্তাম, তা জানস্?'

ভিখারিণী বলে, 'পারস্ তো যা না, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কি?'

'উয়ারে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ'।'

'ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখ্যা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মত কামাস্ তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিখু তখনকার মত প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিণীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটা কির‍্যা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে নাই।

ভিখারিণী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

'ফের লাগ্তে আইছস্? হোই ও বুড়ীর কাছে যা'। ' ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিণীর সামনে রাখিয়া বলে, 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিণী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশী হইয়া বলে, 'নাম শুন্বার চাস্? পাঁচী কয় মোরে, — পাঁচী। তুই কলা দিছিস, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অত বড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশী হওয়ার মত সৌখিন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধূলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে। পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তার সঙ্গেও সে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল — 'ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্য? সেলাম মিয়া হতিছে। লাঠির এক ঘায়ে শিরটি ছেঁচ্যা দিমু নে!'

দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি আর বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না। নিজের তেঁতুল তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, 'র', তোরে নিপাত করতেছি।'

বসির বলিল, 'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি' জানে মাইরা দিমু, আলার কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল।

পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথম বারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসেই মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার তাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকে দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারীর অভাব নাই।

কোন রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নীচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিক ঘেরা যেমন তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পাইলে কোন যুবতী ভিখারিণীই তাহারা সঙ্গে বাস করিতে রাজী হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যে ভাবে কমিয়া আসিতেছে এ ভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয় ত পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না। যে ভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোন উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবারে খুন না করিয়া ফেলিলে কাহারও কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া এক হাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথায়ও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক একদিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মত ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরো কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মাঝে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিষ ভরিয়া জমানো টাকা ক'টি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাত-খানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মত পাথরে ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটি সে ঝুলির সঙ্গে ভরিয়া লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশভরা তারা তখন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা লইয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অবর্ণনীয় উলাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুটস্বরে সে বলিয়া উঠিল, 'বাঁটি লইয়া ডানটির যদি রেহাই দিতো ভগমান!'

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ'হাতে রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোট ছোট অলিগলি দিয়া শহরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দুমাইল তফাৎ এই রাস্তারই পাশে মাইল খানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে ফাঁকে ফাঁকে দুএকটি বাড়ী চোখে পড়ে। তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচসাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘায়ে ন্যাকড়ার পটি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড়, তাহাদের শয্যা ও দেহ হইতে একটা ভাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড়বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া কিছুক্ষণ কচুবনের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারীর কুঁড়ে, দরজার ঝাপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই। ঘরের মধ্যে দাড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃৎপিন্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁহাতের আঘাত ঠিক জায়গা মত না পড়িলে বসির গোলমাল করার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুশকিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা সে প্রায় তিন আঙ্গুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না! শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচীকে বলিল, 'চুপ থাক : চিলাবি তো তোরেও মাইরা ফেলামু!'

পাঁচী চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটুকু আওয়াজ নয়, ভালা চাস তো একদম চুপ মাইরা থাক্।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া লইল।

দম লইয়া বলিল, 'আলোটা জাইলা দে পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটি মাত্র হাতের সাহায্যে অমন যোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া তাহার গর্বের সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'দেখছস? কেডা কারে খুন করল দেখছস? তখন পই পই কইরা কইলাম; মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছাড়ান দেও। শুইনে মিয়াবায়ের হইল গোস্যা। কয় কিনা শির ছেঁইচ্যা দিমু! দেন গো দেন, শির ছেঁইচ্যা দেন মিয়াবাই!, — বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গ-ভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু দুলাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক' হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরে দিমু নাকি সাবাড় কইরা, — অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'ইবারে কি করবি?'

'দ্যাখ কি করি! পয়সা করি কনে গুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়া ছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভাণ করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়। টাকা আধুলিতে এক শত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশী উপার্জন করিয়াছে। তুব সে খুশী হইল। বলিল, 'কি কি নিবি পুটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তার পর ল' রাত রইতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির চাঁদ উঠব, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।'

পাঁচী পুঁটলি বাঁধিয়া লইল! তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চাঁন্দ উঠবো পাঁচী।'

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি ঢুইয়া থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস্ পাঁচী?

'হ, ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামে গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয় ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

টীকা

'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'-মূল সংস্কৃত শোকটি নিম্নরূপ:

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তর্দর্দ্ধং কৃষির্কর্ম্মণি।

তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।'

অর্থাৎ, বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন তথা ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর ধনাগম হয়, কৃষিকর্মেরদ্বারা তার অর্ধেক পাওয়া যায়, রাজসেবা অর্থাৎ সরকারি চাকরির মাধ্যমে তার অর্ধেক লাভ হয়, কিন্তু ভিক্ষায় কিছু লাভ হয় না, হয় না।

বস্তুসংক্ষেপ

সমস্ত বর্ষকালটাই ভিখুর ভয়ানক কষ্টে কেটেছে। আষাঢ় মাসের শুরুতেই বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে দলের এগার জন সদস্যের মধ্যে সে ছাড়া বাকি সকলেই ধরা পড়ে। বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলা দায়ের এক কোপে দুফাঁক করে দিলেও কাঁধে বর্শার মারাত্মক খোঁচা খেয়েও ভিখুই একমাত্র পালাতে পেয়েছিল। রাতারাতি, দশ মাইল হেঁটে কাদা-জলে আত্মগোপন করে অবশেষে আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভিখু উপস্থিত হয়েছিল চিতলপুরে পেহ্লাদ বাগ্‌দীর বাড়িতে। পেহ্লাদ ভিখুকে আহত অবস্থায় আশ্রয় দিতে রাজি হয়নি। খুনের আসামীকে আশ্রয় দিয়ে বিপদ ডেকে আনার আশঙ্কা ছিল তার। ফলে বাধ্য হয়েই মাইল পাঁচেক দূরের বনে আশ্রয় নেয় ভিখু। পেহ্লাদই বনের সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে মাচা বেঁধে দিয়ে ভিখুর থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। ভিখুর জন্য দুদিনের খাবারও রেখে যায় সে। দুদিন পরে পুনরায় খাবার নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যায় পেহ্লাদ। কিন্তু রাতেই ভিখুর জ্বর আসল, ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠল হাত। বৃষ্টির ঠাণ্ডায় আর তাতানো রোদের গুমোটের মধ্যে মশা ও জোঁকের অসহনীয় উৎপাত প্রতিরোধ করে অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় দুদিন -দুরাত্রি পার করে দিল ভিখু।

পেহ্লাদের আসার নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পূর্বেই ফুরিয়ে গেল তার খাবার জল। নির্দিষ্ট সময়েও এল না পেহ্লাদ। বহুকষ্টে মাচা থেকে নেমে পার্শ্ববর্তী নালার জল এনে পিপাসা নিবৃত্ত করল ভিখু। পেহ্লাদের আনা গুঁড়ের লোভে আগত পিঁপড়ার অত্যাচার, রক্তশোষণ করার জন্য ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়া পটলাকৃতি জোঁকের অবাধ বিচরণ আর সাপকে প্রতিহত করার জন্য সতর্ক প্রহরার মধ্যে বেঁচে রইল অবিনাশী মানুষের বংশধর ভিখু। মানুষ বলেই সে মরবে না, বাঁচবেই সে।

পেহ্লাদ বাগ্‌দী গ্রামান্তরে কুটুম বাড়ি গিয়েছিল। কুটুমবাড়ির বিয়ের উৎসবে তাড়ির নেশায় বেহুঁশ হয়ে বিস্মৃত হয়েছিল সে ভিখুকে। সেখান থেকে ফিরে বন্ধুর খোঁজ নিতে গিয়ে ভিখুর বীভৎস অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে পেহ্লাদ। সন্ধ্যা পর্যন্ত বনে অপেক্ষা করে সে। পরে বাড়ি গিয়ে বাঁশের তৈরি ছোট মই ও বোনাই ভরতকে সঙ্গে করে ফিরে আসে। মই-এ শুইয়ে দিয়ে ভিখুকে বহন করে আনে তারা দুজন। নিজের ঘরের মাচার ওপর খড়ের বিছানা পেতে ভিখুর ঘুমানোর ব্যবস্থা করে পেহ্লাদ।

অমিত প্রাণশক্তির কারণেই সামান্য এই আশ্রয়টুকু পেয়ে ভিখু ক্রমশ মৃত্যুকে জয় করে ফেলল। তবে তার ডান হাতটি গাছের মরা ডালের মত শুকিয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। এখন মাঝে-মধ্যে সে বাইরের লোকের অগোচরে বাঁশের মই বেয়ে মাচা থেকে নেমে আসে। একদিন পেহ্লাদের অবর্তমানে ভিখুর অস্বাভাবিক চাহনিতে শংকিত হয়ে পড়ে পেহ্লাদের বউ। দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার মুর্হূতে ভিখু তার একটি হাত চেপে ধরে। কিন্তু দুর্বল ভিখুকে সামান্য আয়াসেই সামলে নেয় বাগ্‌দী ঘরের এই মেয়ে। পেহ্লাদ বাড়িতে ফিরলে ভিখুর কাণ্ড সবিস্তারে বর্ণনা করে দেয় সে। তাড়ির নেশায় আচ্ছন্ন পেহ্লাদ ঘটনাটি শুনে বোনাই ভরতকে নিয়ে আঘাতে আঘাতে আধমরা করে বাড়ির বাইরে ফেলে আসে ভিখুকে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে বাগ্‌দী পাড়ায় পেহ্লাদ বাগ্‌দীর ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে ভিখুর নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারল না পেহ্লাদ।

ঐ-রাত থেকেই শুরু হল ভিখুর আদিম অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়ে একটি ডিঙ্গি নৌকা চুরি করে নদীর স্রোতে ভেসে গিয়েছিল সে। ভোরের দিকে মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছায় ভিখু। নদীর জলেস্নান করে শরীর থেকে রক্তচিহ্ন ধুয়ে ফেলে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ভিখু শহরের ভিতর প্রবেশ করে। রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়, তার সামনেই হাত পেতে ভিক্ষা চায় সে। এভাবেই হয়ে যায় ভিখুর ভিক্ষাবৃত্তির হাতেখড়ি।

কয়েকদিনের মধ্যেই ভিক্ষু রপ্ত করে ফেলে ভিক্ষাবৃত্তির কলাকৌশল। মাঝে মধ্যে অকর্মণ্য ডানহাতটির দিকে তাকিয়ে আপসোস্ হয় তার। ভগবান যদি বাম হাতটি নিয়ে ডান হাতটি রক্ষা করতো তার। সংস্কৃত শোকে ভিক্ষায় অর্থাগম না হওয়ার কথা উলিখিত থাকলেও ভিখুর উপার্জন মন্দ হয় না। ফলে সুখে থেকে ও পেট ভরে খেয়ে অল্প দিনের মধ্যেই পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পায় ভিখু। অবরুদ্ধ কামনার উত্তেজনায় তার মেজাজ ক্রমশ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। স্বরচিত শয্যায় নির্ঘুম ছটফট করে সে। নারীসঙ্গ-হীন নিরানন্দ জীবন আর ভাল লাগে না তার। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনের জন্য মন হাহাকার করে ওঠে।

বাজারের মুখেই পাঁচী নামের এক ভিখারিনী ভিক্ষা করতে বসে। শক্তবাঁধুনি-দেহ অল্পবয়সী এই মেয়ের একটা পায়ে হাঁটুর নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত থকথকে তৈলাক্ত ঘা। এই ঘায়ের জোরেই তার রোজগার ভিখুর চেয়েও বেশি। এ জন্যেই ঘা'টিকে সে বিশেষ যত্নে লালন করে, সারাতে দেয় না। ভিখুর নজর পড়ে এই পাঁচীর দিকেই। আলাপ জমায় সে পাঁচীর সঙ্গে, পরামর্শ দেয় ঘা সারিয়ে ফেলার; ঘা সারলে পাঁচীকে আর ভিক্ষা করতে হবে না, ভিখুর সঙ্গেই সে থাকতে পারবে। কিন্তু পাঁচী এতে রাজি হয় না। পরে ভিখু যদি তাকে তাড়িয়ে দেয় তখন জীবিকার অবলম্বন ঘা'টি সে

কোথায় পাবে! ভিখু প্রতিজ্ঞা করে একনিষ্ঠতার, সুখে রাখবার লোভ দেখায়। কিন্তু পাঁচীর মন এতে ভেজে না। পরে একদিন ঘা-সমেতই পাঁচীকে সঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দেয় ভিখু। কিন্তু ইতোমধ্যে দেরী হয়ে গেছে ভিখুর। পাঁচী অদূরবর্তী আর এক ভিখারী বসিরকে দেখিয়ে বলে ওর সঙ্গেই এখন তার সহবাস। বসিরও খঞ্জ ভিখারী। ভিখুর ডান হাতটির মতোই তারও এক পা হাঁটুর নীচে শুকিয়ে গেছে। ঐ শুকনো পা'কে অবলম্বন করেই বসিরের জীবিকা নির্বাহ হয়। ভিখু আলাপের অজুহাতে পাশে বসতে চাইলে পাঁচী বাসিরের নাম করে ভিখুকে খুন করার ভয় দেখায়। ভিখু হেসে উড়িয়ে দেয় পাঁচীর কথা। এককালে ভিখু নিজেই কত মানুষকে একা ঘায়েল করে দিয়েছে।

নিজে থেকেই বসিরের সঙ্গে আলাপ করে ভিখু। প্রথম সম্বোধনেই ক্ষিপ্ত বসির ভিখুর মাথা লাঠির ঘায়ে 'ছেঁচা' দেয়ার হুমকি দেয়। এতে ভিখুর রক্তও তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দুজনই বিপদজনকভাবে আক্রমণোদ্যত হওয়ায় মারামারি আর হয়ে ওঠে না। ফিরে আসার আগে ভিখু বসিরকে নিপাত করার হুমকি দেয়।

ক্রমে ভিখুর উপার্জনও কমে আসে। কোন রকমে পেট চলে তার। ভিখু ভাবে যে কোনো ভাবেই আয় বাড়াতে হবে তাকে। কিন্তু অকর্মণ্য ডান হাত নিয়ে আয় বাড়াবে কিভাবে সে? চুরি-ডাকাতি করার উপায় নেই। একেবারে খুন করে না ফেললে কারও কাছ থেকে অর্থ ছিনিয়ে নেয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। পাঁচীকে ফেলে অন্যত্র যাওয়ার কথাও চিন্তা করতে পারে না ভিখু। বিন্নু মাঝির সুখের সংসার ঈর্ষাতপ্ত করে তোলে তার মন। অবরুদ্ধ কামনা ও হিংস্রতায় এক এক সময় মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে হত্যা করে পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করতে না পারলে তার শান্তি হবেনা।

অসন্তোষের মধ্যদিয়েই কিছুদিন সময় কাটে তার। একদিন গভীর রাতে ঝুলির মধ্যে সঞ্চিত মূল্যবান জিনিস ভরে এবং কোমরের কাপড়ে জমানো টাকা শক্ত করে বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ভিখু। কুড়িয়ে পাওয়া একটা লোহার শিক ঘষে ঘষে একপ্রান্ত চোখা করে রেখেছিল সে। এই ধারালো অস্ত্র টিও সে ঝুলির মধ্যে ভরে সঙ্গে নেয়। অন্ধকার রাতে ঈশ্বরের পৃথিবীতে তখন শান্তস্তব্ধতা। জনহীন সেই মধ্যরাতে হেঁটে হেঁটে শহরের অপরপ্রান্তে অবস্থিত বসিরের ডেরায় পৌঁছায়। পূর্বেই একদিন ওদেরকে গোপনে অনুসরণ করে আস্তানাটি দেখে গিয়েছিল ভিখু। ভিখারীর কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না বলে সহজেই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় ভিখু। অন্ধকারে হৃদ্‌পিন্ড শনাক্ত করা সম্ভব নয় বলে শান্ত মাথায় একটি মাত্র আঘাতে বসিরের তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা প্রায় তিন আঙ্গুল পরিমাণ ঢুকিয়ে দেয় ভিখু। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য একহাতে সবলে বসিরের গলাও চেপে ধরে সে। মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে পাঁচীকে চিৎকার করতে বারণ করে ভিখু। পরে বসিরের মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসংশয় হলে পাঁচীকে আলো জ্বালাতে আদেশ করে সে। পাঁচী আলো জ্বাললে পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি প্রত্যক্ষ করে উলসিত হয় ভিখু। পাঁচীকেও হত্যা করার কপট ভয় দেখায় সে। ভীত পাঁচী পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ভিখু বসিরের সঞ্চিত অর্থের হদিস জানতে চায়। বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করেছিল পাঁচী। ভিখুর সামনে প্রথমে এ-বিষয়ে অজ্ঞতার ভান করলে ভিখু পাঁচীর চুলের মুঠি চেপে ধরে। অগত্যা ভীত পাঁচী দেখিয়ে দেয় বসিরের সঞ্চিত অর্থ রাখার স্থানটি। টাকায় আধুলিতে বসিরের শতাধিক টাকার সঞ্চয় অধিকার করে খুশি হয় ভিখু। পরে পাঁচীকে পুটলি বেঁধে রাতের মধ্যেই যাত্রা করার কথা বলে। কিছুক্ষণ পরেই নবমীর চাঁদ উঠবে আকাশে, আলোয়-আলোয় পথটুক পার হতে হবে! পাঁচী পুটলি বেঁধে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তায় গিয়ে ওঠে। পায়ের ঘা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে কষ্ট হচ্ছিল পাঁচীর। ভিখু সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে পাঁচীর পায়ের ব্যথা হচ্ছে কি না জিজ্ঞেস করে। পাঁচী তার কষ্টের কথা জানায়। ভিখু তাকে পিঠে চাপাবে কিনা জিজ্ঞেস করলে পাঁচী ভিখুর শক্তি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে। ভিখু তার শারীরিক সামর্থ্যের কথা জানিয়ে পাঁচীকে তার পিঠে সওয়ার হতে আহ্বান করে।

ভিখুর গলা জড়িয়ে ধরে পাঁচী তার পিঠের ওপর ঝু'লে রয়। তার দেহের ভারে সামনে ঝুকে ভিখু জোরে জোরে পথ চলে। দূর গ্রামের গাছপালার পেছনে থেকে নবমীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

ঐ চাঁদ আর এই পৃথিবীর হয়তো ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ থেকে সংগ্রহ করে দেহের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে এসেছিল, সেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারই তারা নিজেদের সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রেখে যাবে। পৃথিবীর আলো ঐ প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের নাগাল আজও পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন:

১. ভিখুর অতীতের জীবন কেমন ছিল?
২. ভিক্ষাজীবী হিসেবে ভিখুর আত্মপ্রকাশের হেতু কী?
৩. ভিখুর ভিক্ষুক-জীবনের পরিচয় দিন।
৪. স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর ভিখুর মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল?
৫. পাঁচীর প্রতি ভিখুর আকর্ষণের কারণ কী?
৬. উপার্জন কমে আসলে ভিখুর মানসিক অবস্থার পরিচয় দিন।
৭. বসির-হত্যাকান্ড সংঘটনে ভিখুর পৈশাচিক আচরণের বর্ণনা দিন।

১নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তর:

গল্পে বিধৃত ভিখুর সমগ্র জীবনই ঘটনাবহুল। হিংস্রতা ও পৈশাচিক উন্মাদনায় ভিখুর অতীত জীবন যে পূর্ণ ছিল গল্পে তার পরিচয় ভিখুর ভাবনাসূত্র থেকে পাওয়া যায়। বর্ষারম্ভে বসন্তপুরে ডাকাতি করতে গিয়ে বৈকুণ্ঠসাহার মেজো ভাইয়ের গলা দা'য়ের এক কোপে দুফাঁক করে দেয়ার পর থেকেই মূলত ভিখুকে পলাতক জীবন বা অজ্ঞাতবাস বেছে নিতে হয়। এ-সময় থেকে বসির হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত কাল অকর্মণ্য হাত নিয়ে অতীত উদ্দাম জীবনের স্মৃতিচারণ ছাড়া উপায় ছিল না ভিক্ষাজীবী ভিখুর।

ঐ-পর্যায়ে ভিখুর ভাবনাসূত্র থেকেই জানা যায় যে, ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গলাধকরণ করে উন্মত্ত রাত্রিযাপনে অভ্যস্থ ছিল সে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে গৃহস্থবাড়িতে চড়াও হয়ে লোকজনকে হত্যা এবং টাকা ও গহনা লুণ্ঠন করে রাতাতাড়ি উধাও হয়ে যেত ভিখু। স্ত্রীর সামনে স্বামীকে হত্যা করে অবর্ণনীয় পুলক অনুভব করতো সে। পুত্রের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরার সময়ে মায়ের সকাতর আর্তনাদের দৃশ্য প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোয় উন্মাদনাকর নেশা ধরিয়ে দিতো ভিখুর চিত্তে। পুলিশের ভয়ে বনে জঙ্গলের পলাতক জীবনেও ছিলো ভিখুর অপরিসীম রোমাঞ্চ ও আনন্দ। দলের অনেকেই বিভিন্ন মেয়াদে একাধিক বার জেল খেটেছে, কিন্তু ভিখুকে একবারের বেশি পুলিশ ধরতে পারেনি। একবার এক নারী-অপহরণের মামলায় সাত বছরের জেল হয়েছিল তার। কিন্তু দুবছরের বেশি জেল খাটতে হয়নি ভিখুকে; এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলখানার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল সে। এরপর জেল-পলাতক ফেরারী জীবনে ভিখু একা বহু গৃহস্থবাড়িতে বেড়া কেটে চুরি করেছে, দিনে দুপুরে পুকুরঘাটে একাকিনী গৃহস্থবধূর মুখ চেপে ধরে গলার হার, হাতের বালা ছিনতাই করেছে, পরস্ত্রী অপহরণ করে কাটিয়েছে প্রবাসজীবন; আবার প্রবাস থেকে একাকী প্রত্যাবর্তন করে তিনবার তিনটি দল গঠন করে গ্রামে-গ্রামে ডাকাতি করে বেড়িয়েছে পৈশাচিক উন্মাদনায়।

৪ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তর:

ভিক্ষুক-জীবনে প্রবেশ করে ভিক্ষাবৃত্তির কলাকৌশল আয়ত্ত করে ফেলার কারণে ক্ষুধার অন্নের অভাব হয়নি ভিখুর। ফলে দুবেলা পেটভরে খেয়ে ফিরে পেল সে তার লুপ্ত স্বাস্থ্য। পূর্বের মতই তার বুকের ছাতি ফুলে উঠল, অঙ্গ-সঞ্চালন মাত্র তার হাতের ও পিঠের মাংস-পেশী নেচে উঠতে শুরু করল। ক্ষুধার কষ্ট নিবৃত্ত হওয়া মাত্রই জেগে উঠল তার মনের ক্ষুধা। অবরুদ্ধ ও অবদমিত শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল। অভ্যস্ত বুলি আওড়িয়ে সকরুণভাবেই সে ভিক্ষা প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রত্যাশাবঞ্চিত হলেই ক্রোধের সীমা থাকে না তার। জনবিরল পথে কোন পথচারী তাকে উপেক্ষা করে চলে গেলে, পথিককে গালি দিতে পর্যন্ত ভয় পায় না ভিখু। এক পয়সার জিনিস কিনে দোকানীর কাছ থেকে অযৌক্তিক ফাউ প্রত্যাশা করে মারমুখী হয়ে ওঠে সে। ভিক্ষা প্রার্থনার ছলে নদীর ঘাটেস্নানরত মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আনন্দ পায় ভিখু;স্নানার্থিণীরা ভয় পেলে দুর্বিনীতি অসভ্যের মত পুলকানন্দে দাঁত বের করে হাসে, নড়ে না।

ক্ষুধার অন্নে জীবন-অস্তিত্বের সংকট নিরসন হওয়া মাত্রই ভিখুর অন্তর্গত প্রাগৈতিহাসিক কামনা লোলুপ রাক্ষসের ক্ষুধা নিয়ে আবির্ভূত হয়। রাত্রে খড় দিয়ে তৈরি স্বরচিত শয্যায় ছটফট্ করে সে। নারী-সঙ্গহীন সাদামাটা জীবন এখন আর ভাল লাগে না ভিখুর। অতীতের লোমহর্ষক জীবনের জন্য তার মন হাহাকার করে ওঠে। নিজের অকর্মণ্য ডান হাতটির দিকে তাকিয়ে আপসোসের সীমা থাকে না অসহায় ভিখুর।

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন:

১. শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না।

২. 'দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা'টি মুই তখন পামু কোয়ানে?'

৩. ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়।

৪. দূর গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

৫. পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।

৩ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তর:

আলোচ্য গদ্যাংশটুকু কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প থেকে গৃহীত হয়েছে।

উদ্ধৃত অংশে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখুর শরীরমুখী প্রেম প্রসঙ্গে তীর্যক শেষ প্রকাশিত হয়েছে।

এককালের দুর্ধর্ষ ডাকাত ভিখু অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই আঘাতপ্রাপ্ত অকর্মণ্য হাত নিয়ে ভিক্ষুকের পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়। ভিক্ষায় ধনাগম না-হাওয়ার সংস্কৃত প্রবাদবাক্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করেই জমে উঠে ভিক্ষাজীবী ভিখুর পসার। এখন আর ক্ষুধার অন্নের কষ্ট নেই তার। ফলে জীবন-অস্তিত্ব রক্ষার সংকট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভিখু ক্রমশ পুনরুদ্ধার করে ফেলে লুপ্ত স্বাস্থ্য। উদরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া ভিখুর শরীরী ক্ষুধা প্রবল হয়ে ওঠে। পাশবিক উন্মাদনায় যার ঘটনাবহুল অতীত অতিবাহিত হয়েছে, সেই ভিখু এখন রাত্রে স্বরচিত শয্যায় ছটফট করে; নারীসঙ্গহীন নিরুৎসব জীবন বিস্বাদ ঠেকে তার।

এ-অবস্থাতেই ভিখারিণী পাঁচীর সঙ্গে পরিচয় হয় ভিখুর। শক্ত-বাঁধুনি-দেহ কমবয়সী মেয়ে পাঁচীর হাঁটুর নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত থকথকে তৈলাক্ত ঘা। এই ঘা'ই তার উপজীবিকার বিজ্ঞাপন। ফলে প্রযত্ন পরিচর্যায় ঘাটি রক্ষা করে সে, কোনো অবস্থাতেই সারতে দেয় না। এই পাঁচীর প্রতিই প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়ে ভিখুর। ঘা'টি সারিয়ে ফেললে পাঁচীকে নিয়ে একা বাস-এর লোভনীয় প্রস্তাব করে সে। কিন্তু পাঁচীরও জীবন-অভিজ্ঞতা নেহায়েৎ স্বল্প নয়। সে জানে ঘা-মুক্ত পাঁচী সহবাস কালে পরিত্যাজ্য হলে লুপ্ত ঘা ফিরে পাবে না। কাজেই উপজীবিকার অবলম্বন এই ঘা সারাতে পাঁচী কোনো উৎসাহ বোধ করে না। কিন্তু ভিখু নিরাশ হয় না, প্রতিনিয়ত সে পাঁচীকে উত্যক্ত করে চলে।

কখনো সে একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিজ্ঞা করে, পাঁচীকে সুখে রাখার লোভ দেখায়। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হয়। প্রকৃতিলোকে শীতের আমেজ বায়ুস্তরে মাদকতা সঞ্চার করে। ভিখুর চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখের নীড় ঈর্ষার সূক্ষ্ম বিষ সংক্রমিত করে দেয় তার মনে। ফলে অবদমিত শরীরী ক্ষুধার উত্তাপে ভিখুর অন্তর্গত ঘৃণা অন্তর্হিত হয়। থকথকে তৈলাক্ত ঘা সমেতই পাঁচীকে ঘরে তুলতে মনস্থ করে সে। শরীরী প্রেমের খরতাপের প্রাবল্যে বিবমিষা সৃষ্টকারী ঘৃণা তিরোহিত হয়।

৪ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তর:

উদ্ধৃত বাক্য দুটি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের অন্তর্গত।

আলোচ্য অংশে পরিপ্রেক্ষিত-রূপে স্থাপিত চিরকালীন প্রকৃতি-দৃশ্যের অনুষঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রাগৈতিহাসিক মানবীয় প্রবৃত্তির অস্তিত্বের ইঙ্গিত অভিব্যক্তি পেয়েছে।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের শেষাংশে দেখা যায় পৈশাচিক ক্রূরতায় বসিরকে হত্যা করে ভিক্ষাজীবিনী পাঁচীকে করায়ত্ত করে ভিখু। নারীসঙ্গহীন নিরানন্দ জীবনের অবসান কল্পেই আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত ভিখু শারীরিক পঙ্গুত্ব সত্ত্বেও নির্দয় নরহত্যার পথকেই বেছে নেয়। হত্যাকান্ড সম্পন্ন করে পাঁচীকে নিজের পিঠে চাপিয়ে ভিখু অন্ধকারে রওয়ানা হয় নতুন গন্তব্যে। গত্মকার ভিখুর এই অভিযাত্রার পরিপ্রেক্ষিত-রূপে স্থাপন করেছেন চিরকালীন প্রকৃতিকে। দূর গ্রামের গাছপালার পেছন থেকে নবমীর চাঁদ তখন আকাশে উদীয়মান আর ঈশ্বরের পৃথিবীতে বিরাজমান শান্ত স্তব্ধতা। গত্মকার মনে করেন চিরকালীন প্রকৃতির অংশ চাঁদ আর পৃথিবীর হয়তো ইতিহাস আছে, কিন্তু উত্তরাধিকার-সূত্রে যে ধারাবাহিক

প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার নিজেদের দেহের অভ্যন্তরে সঞ্চয় করে ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সেই আদিম যৌন-চেতনা তারাও তাদের সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্চারিত করে যাবে। সভ্যতার আলো প্রাগৈতিহাসিক এই অন্ধকারের নাগাল কখনোই পাবে না। শান্ত পৃথিবী আর উদীয়মান নবমীর চাঁদের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যৌনচেতনার প্রতিস্থাপনায় গত্মকার ঐ উভয় প্রসঙ্গেরই আদিমতা বা চিরকালীনতাকে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন:

১. ভিখু-চরিত্র বিশেষণ করুন।

২. ভিখু চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি — অস্তিত্ব রক্ষা না কি প্রবৃত্তি-তাড়না? প্রসঙ্গ দুটি বিশেষণ করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করুন।

১ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা- উত্তর:

কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য চরিত্র। পৈশাচিক লোলুপতায় আর অস্তিত্বরক্ষার প্রাণান্তকর সংগ্রামশীলতায় রক্তমাংসের এক জীবন্ত মানুষ ভিখু। ভিখুর চরিত্র রূপায়ণে সৃজয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সভ্যতার বিকাশধারার অনুষঙ্গে আদিম প্রবৃত্তির বাহক মানুষের সংগুপ্ত যৌনচেতনাকে মৌল কেন্দ্রে স্থাপন করে একটি তীর্যক শেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। শারীরিক অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে ভিখু যেমন আপসহীন সংগ্রামী, তেমনি শারীরিক অস্তিত্বের ন্যূনতম শর্ত পূরণ হওয়া মাত্রই দেহজ কামনার চরিতার্থতা প্রতিষ্ঠায় স্বেচ্ছাচারী লিবিডো-ভারাতুর কামুক। বস্তুত অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রবৃত্তি-তাড়নার সংশেষণীতে ভিখু চরিত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

ভিখুর নিরবচ্ছিন্ন পৈশাচিকতার পশ্চাতে সদাসক্রিয় তার 'অপরিসীম প্রাণময়তা ও জীবনোদ্যম'। অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রান্তবাসী মানুষ ভিখু ব্যক্তিগত সুখ প্রতিষ্ঠার বশবর্তী হয়েই পরিণত হয়েছে দুর্ধর্ষ ডাকাত-খুনিতে। তবে ডাকাতির পর্যায়ে তার পৈশাচিক আচরণ ও অনুভূতি ব্যক্তি-অস্তিত্বের উপভৌগিকতার মধ্যে কুণ্ঠায়িত হলেও, শারীরিক অস্তিত্বের বিপন্নতার মুহূর্তে তার বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর সংগ্রামশীলতায় অনিঃশেষ জীবনীশক্তির যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন গত্মকার — তা বন্ধুর মানবেতিহাসের দিকেই আকৃষ্ট করে পাঠককে। বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে নরহত্যা শেষে ডান হাতে বর্শার খোঁচা খেয়ে অকর্মণ্য ও জীবন-সংকটাপন্ন ভিখুর বনবাসকালীন সময়ের বর্ণনায় মানুষের অপরাজিত প্রাণশক্তির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন গত্মকার। অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে জীবনযোদ্ধা ভিখু প্রসঙ্গে গত্মকার লিখেছেন:

'... একহাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারি দিকে লাগাইয়া দিল।...

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না, সেই অবস্থায়, মানুষ সে, বাঁচিবেই।'

ভিখুর অস্তিত্ব-সংগ্রামের ঐ-পর্যায়েই বন্ধু পেহ্লাদ বাগ্‌দী বিপদ-আশঙ্কা করে নিজগৃহের মাচায় স্থান করে দেয় তাকে। ন্যূনতম আহার ও আশ্রয়ের বদৌলতে প্রচণ্ড জীবনশক্তির অধিকারী ভিখু ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু শারীরিক অস্তিত্বের সংকট তিরোহিত হওয়া মাত্রই তার মধ্যে জেগে ওঠে অবদমিত ইন্দ্রিয়জ কামনা। ফলত, স্বাধিকার প্রমত্ত ভিখু একদিন মাচা থেকে নেমে লোলুপ দৃষ্টিপাতে বন্ধু-পত্নীর হাত আকর্ষণ করে। তবে অকর্মণ্য ডান হাতের কারণে বাগ্‌দী ঘরের সবলা মেয়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না সে। লক্ষণীয়, ভিখু নির্লজ্জ অনধিকার-চর্চা করে আপৎকালে বন্ধুর সহায়তার জবাব দেয় কৃতঘ্নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে। তবে এক্ষেত্রে, ভিখুর কৃতঘ্ন স্বভাবের পরিচয় প্রদানই গত্মকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সিগমুন্ড ফ্রয়েড-কথিত লিবিডোচেতনার সমন্বয়ে ভিখু চরিত্রকে রূপময় করে তোলা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভিখুর অবদমিত এই লিবিডো চেতনা পেহ্লাদ বাগ্‌দীর তৎপরতায় সাময়িক প্রতিহত হলেও, ঐ-চেতনাই ভিখুর অবশিষ্ট জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

উপজীবিকা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নিয়ে ভিখুর জীবনে যখন সুদিন ফিরে এসেছে — ক্ষুধার অন্ন ও আশ্রয়ের সংকট দূরীভূত হয়ে যখন প্রাক্তন সবল স্বাস্থ্য সে পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছে, তখনই বিবমিষা সৃষ্টিকারী থক্‌থকে ঘা সত্ত্বেও ভিক্ষাজীবিনী পাঁচীর সহবাস প্রত্যাশা করেছে সে। প্রত্যাশা পূরণের জন্যে পাঁচীর সঙ্গী বসিরকে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি ভিখু। এভাবেই ভিখু চরিত্রে প্রভূত 'জীবনোদ্যমে'র সঙ্গে ফ্রয়েড-কথিত নীতিহীন ইদম সমন্বিত করেছেন গত্মকার।

বলিষ্ঠ পেশী শক্তির আস্ফালন, অভিলাষ বাস্তবায়নের নির্দয় প্রয়াস এবং প্রবল প্রাতিকূল্যকে প্রতিহত করে বেঁচে থাকার নিরন্তর সাধনার মধ্যে ভিখুর সংগ্রাম মানসতা ও জীবনানুরাগ যুগপৎ প্রতিফলিত। পাঠকচিত্তে ভিখুর অবিস্মরণীয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার হেতু ঐ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ভিখুর চরিত্র বিশেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'ভিখুর বলিষ্ঠ বীভৎস আদিম মানব-রূপটি লেখক অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন ও ভিখুর পরিণাম নির্ভুলভাবে দেখিয়েছেন। ভিখুর জীবনে সভ্যতার আলো পড়েনি। প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে তার উত্থান ও বিলয়।' (কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২)

ভিখুর মধ্যকার আদিমতা প্রবহমান মানবজীবনধারায় এখনো যে প্রবহমান ভিখুর চরিত্র-রূপায়ণের মধ্যদিয়ে এ সত্যই প্রতিষ্ঠা করেছেন গত্মকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীকার সরোজমোহন মিত্র এ প্রসঙ্গটিকে উপলক্ষ করেই লিখেছেন- 'বাংলা সাহিত্য যখন কেবল নির্জীব চরিত্রের বিষাদময়তায় ভারাক্রান্ত হচ্ছিল তখন ভিখুর চরিত্র যেন বিদ্রোহীর মত আত্মপ্রকাশ লাভ করল।' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, সরোজমোহন মিত্র, ১৯৮২)।

ভিখুর ভিক্ষুক-জীবন তার অস্তিত্বরক্ষার উপায়হীন অবলম্বন মাত্র। এ পেশা পরিচালনায় সে যতটা না আন্তরিক তার চেয়ে অধিক অভিনয়-দক্ষ। একই পথ দিয়ে নিয়মিত চলাচল করে যে পথিক, স্থায়ী আসন গেড়ে বসা ভিখারির পক্ষে তার মনোযোগ আকর্ষণ না করারই কথা। কিন্তু জনবিরলতার সুযোগে এমন উদাসীন পথিককে গালিবর্ষণ করতে পর্যন্ত দ্বিধা জাগে না ভিখুর। ভিক্ষার বিজ্ঞাপন প্রচারের স্বার্থে খয়রাতি কোটের ডান হাত ছিঁড়ে ফেলে অকর্মণ্য হাতকে সকলের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি সীমায় আনতে তার আন্তরিকতা ও তৎপরতার পরিচয়ও গল্পে বিধৃত। সৈয়দ আজিজুল হক যথার্থই লিখেছেন: 'ভিখুর ঈর্ষাদগ্ধ জিঘাংসামূলক মনোভাবের মূলে সক্রিয় তার ভোগবাদী রিরংসা-পরায়ণতা। শারীরিক পঙ্গুত্ব ও সামাজিক বঞ্চনা তার মনে যে সীমাহীন পরিতাপ ক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার করে, প্রবল জীবনতৃষ্ণাই তার কারণ।' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ, ১৯৯৮)

ভিখু চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে গত্মকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনুষ্য জীবনের গতিপ্রকৃতিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। তিনি মনে করেন, সভ্যতার বিকাশধারা সত্ত্বেও মানুষ কিছু প্রাগৈতিহাসিক প্রবৃত্তিকে নিজের মধ্যে সংগোপনে লালন করে চলেছে। ভিখুর অবদমিত যৌনক্ষুধা প্রাগৈতিহাসিক জীবন-উৎসেরই প্রবহমান উত্তরাধিকার। গল্পের উপান্তে পাঁচীকে নিয়ে ভিখুর নতুন অভিযাত্রার মূল্যায়নে তিনি বলছেন যে, ভিখু ও পাঁচী ধারাবাহিক যে অন্ধকার মাতৃগর্ভ থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের দেহাভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই অন্ধকারই তারা তাদের সন্তানে মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে সংক্রমিত করে দেবে। এ-ধারাবাহিক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার কোনদিনই পৃথিবীর সভ্যতার আলোর নাগাল পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। প্রবল জীবনানুরাগ ও সংগ্রাম-মানসতা সত্ত্বেও ভিখু ঐ প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের বাহক হিসেবেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে গল্পটিতে। এখানেই ভিখুর স্বাতন্ত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য।

◆ ◆

নয়নচারা

পাঠ-৩

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
(১৯২২-১৯৭১)

উদ্দেশ্য

সমগ্র পাঠটি পড়ে আপনি —

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলার মহামন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- দুর্ভিক্ষে গ্রাম থেকে উন্মলিত শহরের পথচারী ক্ষুধার্ত মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের পরিচয় দিতে পারবেন।
- আমুর অবচেতন মনের অনুভূতিপুঞ্জ নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- গল্প অবলম্বনে দুর্ভিক্ষাবস্থায় শহর ও গ্রাম এবং ধনী ও নি:স্বের পার্থক্য বিচার করতে পারবেন।
- গল্পটির শিল্পমূল্য বিশেষণ করতে পারবেন।
- 'নয়নচারা' গল্পের নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবেন।

লেখক-পরিচিতি

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্, মাতা নাসিম আরা খাতুন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সহায়ক পারিবারিক পরিএন্ডলে অতিবাহিত হয় বাংলা সাহিত্যের এই অসামান্য শিল্পীর শৈশব-জীবন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র পিতৃ ও মাতৃ উভয় পরিবারই ছিলো ধনে-মানে-জ্ঞানে-রুচিতে সম্ভ্রান্ত। পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির এম.এ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। মাতামহ মৌলবী আবদুল খালেক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে স্নাতক হয়েছিলেন।

সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন বলে ওয়ালীউল্লাহ্র সমগ্র স্কুলজীবন কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যায়তনে কেন্দ্রীভূত থাকেনি। ১৯৩৯ সনে তিনি কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পূর্বে পিতার চাকুরি-সূত্রে তিনি মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফেনি, চিনসুরা, হুগলি ও সাতক্ষীরা স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দেই ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্। ঐ কলেজের ম্যাগাজিনেই লেখক ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম আবির্ভাব। আই.এ পাশ করে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য তিনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন এবং ঐ-কলেজ থেকে ১৯৪৩ সনে ডিসটিংশনসহ বি.এ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে এম.এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে পিতার জীবনাবসানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত থাকলেও এ-সময় ওয়ালীউল্লাহ্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে, পেশাজীবনে প্রবেশের কারণে। পেশাগত দায়িত্বপালনের পাশাপাশি এ-পর্যায় থেকেই মূলত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন।

১৯৪৫ সনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে যোগদান করেন। ঐ-বছরই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস বিষয়ক ত্রিমাসিক ইংরেজি পত্রিকা 'কনটেমপোরারি'। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের পর 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার চাকুরি পরিত্যাগ করে 'রেডিও পাকিস্তান' ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা-সম্পাদক পদে যোগদান করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পদোন্নতি পেয়ে 'রেডিও পাকিস্তান' করাচি কেন্দ্রে বার্তা-সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৫১ সনে পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় 'প্রেস- অ্যাটাশে' পদে নিয়োগ দেয়া হয় তাঁকে। ১৯৫২ সনে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে তাঁকে বদলি করা হয়। ১৯৫৪ সনের অক্টোবরে সিডনি থেকে তাঁকে ঢাকায় আঞ্চলিক তথ্য-অফিসে তথ্য-অফিসার পদে বদলি করা হয়। ১৯৫৬ সনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জাকার্তায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য-পরিচালক পদে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু তথ্য-পরিচালকের পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তাঁর এ চাকুরি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ফলে ১৯৫৭ সনে জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-অ্যাটাশে পদে নিয়োগ দেয়া হয় তাঁকে।১৯৫৮ সনে সামরিক শাসনামলে তাঁকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে এনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করে রাখা হয়। আবার ১৯৫৯ সনে প্রথমে লন্ডনে এবং পরে বন্-এ প্রেস-অ্যাটাশে পদে কিছুকাল কাজ করেন

ওয়ালীউল্লাহ্। ১৯৬০ সনে ফার্ষ্ট সেক্রেটারি হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন তিনি। ১৯৬১ সনে পাশ্চাত্যের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির তীর্থ-নগরী প্যারিসে বদলি করা হয় তাঁকে। প্যারিসে দীর্ঘবাস কালে ১৯৬৭ সনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পি-৫ গ্রেডে ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট পদে প্যারিস- অফিসেই যোগদান করেন। ১৯৭০ সনের ৩১ ডিসেম্বর ইউনেস্কোর সঙ্গে তাঁর চুক্তি ভিত্তিক চাকুরির মেয়াদ শেষ হলে ইসলামাবাদ বদলির সরকারি সিদ্ধান্ত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রত্যাখান করেন। অতঃপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থসংগ্রহে আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন তিনি। ১৯৫৩ সনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ফরাসি বংশোদ্ভূত অ্যান-মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবো-র সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পূর্বেই মাদাম অ্যান-তিবো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন ও আজিজা মোসাম্মাৎ নাসরিন নাম গ্রহণ করেন।

বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিক শিল্পরীতির প্রবক্তা, রাজনীতি ও সময় সচেতন কথাশিল্পী ও নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যিক-জীবনের স্ফূর্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী '৪৩-এর দুর্ভিক্ষপীড়িত কলকাতায়। তবে তাঁর প্রথম রচনা 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' প্রকাশিত হয় Dacca Intermediate College Annual- এ।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রবক্তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কথাসাহিত্যের দুই শাখা উপন্যাস ও গল্প এবং নাট্য রচনায় সমান দক্ষ। তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস-নাটক বাংলাদেশের সাহিত্যকে উন্নীত করেছে বিশ্বমানে। দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড ঔপন্যাসিক দস্তয়ে ভস্কি এবং দার্শনিক-ঔপন্যাসিক জাঁ পল সাত্রে প্রচারিত অস্তিত্ববাদী দর্শন এবং আধুনিক প্রকাশবাদী-প্রতীতিবাদী ও পরবাস্তববাদী শিল্পপ্রকরণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সমগ্র সাহিত্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। জীবনের একটি বৃহৎ সময় প্রবাসে কাটালেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সকল রচনারই পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে বাংলাদেশের দেশ-কাল-সমাজ-জীবন।

১৯৭১ সনের ১০ অক্টোবর মধ্যরাতে ফ্রান্সের প্যারিস নগরের উপকণ্ঠে নিজের ফ্ল্যাটবাড়িতে পাঠরত অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্র জীবনাবসান ঘটে।

সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্র গ্রন্থাবলি

ছোটগল্প: নয়নচারা (১৯৪৫), দুইতীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)। এছাড়াও তাঁর আরও বত্রিশটি 'অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছ' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ডে সংকলিত হয়েছে।

উপন্যাস : লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)

নাটক : বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গ ভঙ্গ (১৯৬৫), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), উজানে মৃত্যু (সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩; স্বতন্ত্রভাবে অগ্রন্থিত এ নাটক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ডে সংকলিত হয়েছে।)

রচনা-পরিচিতি

নয়নচারা গল্পগ্রন্থের নাম-গল্প 'নয়নচারা'। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম গ্রন্থ 'নয়নচারা' ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৫১) কলকাতার পূর্ব্বাশা লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে সংকলিত আটটি গল্পের প্রথম গল্প 'নয়নচারা'। গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বে 'নয়নচারা' সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত **পূর্ব্বাশ** মাসিক পত্রে মুদ্রিত হয়।

'নয়নচারা' গল্পটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দের (১৯৪৩ খ্রি:) 'The Great Bengal Famine' বা মহামন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত। গল্পকারের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ এবং কেন্দ্রিয় চরিত্র আমুর অবচেতন মনের কথকতার সংমিশ্রণ 'নয়নচারা'র গঠনশৈলীর সর্বাপেক্ষা উলেখযোগ্য প্রান্ত। সর্বজ্ঞ লেখকের বহির্বাস্তব এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র আমুর অন্তর্বাস্তবতানিষ্ঠ বর্ণনা ও অনুভূতিপুঞ্জ এক স্বকীয় গদ্যকলায় বিন্যস্ত হয়েছে গল্পটিতে। দুর্ভিক্ষপীড়িত অন্নহারা শহরমুখী মানুষের এই কাহিনীর ভিত্তি দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধশাসিত দেশকালের মৃত্তিকায় প্রোথিত। গল্পটির স্থানিকপট কলকাতা মহানগরীকে উপলক্ষ করে নির্মিত হলেও, আমুর অবচেতন মনের অনুষঙ্গে ময়ুরাক্ষী নদীর তীরবর্তী গ্রামীণ জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

'নয়নচারা' গল্পে সর্বজ্ঞ লেখকের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমুর চেতন-অবচেতন মনোলোকই মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। তার চেতনা-শাসিত মনোলোক উন্মোচনে গল্পকার ব্যবহার করেছেন পরাবাস্তববাদী শিল্পরীতি। আমুর চেতনার অনুষঙ্গে স্বপ্নময় উলম্ফনধর্মী চিত্র সমাহার যোজনায় ব্যবহৃত প্রাতিস্বিক গদ্য 'নয়নচারা' ও তার সৃজয়িতার গৌরব।

মূলপাঠ

ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী : রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলে ডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লাল্‌চে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মত মৃদু-মৃদু জ্বলে।

তবে, ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে : ময়ূরাক্ষী। কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া। যে হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে?

ফুটপাথে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেরেছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে — মৃত্যুর মত নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নামে তন্দ্রার, এবং যদিবা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয় — দেহে : মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কল্পনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুন্‌চে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলেডিঙিগুলোর পানে চেয়ে ভাবচে। ভাবচে যে এরই মধ্যে হয়তো বা ডিঙির খোদল ভরে উঠেচে বড় বড় চকচকে মাছে — যে চকচকে মাছ আগামী কাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারী করে তুলবে জেলেদের ট্যাঁক। আর হয়তো বা — কী হয়তো বা ?

কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ খ খ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামচে না। তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়। কাশে, কখনো বা ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, অথচ ঘুম লেগে থাকে জোঁকের মত। ভুতনির ভাই ভুতো কাশে না বটে তবে তার গলায় কেমন ঘড় ঘড় আওয়াজ হয় একটানা, যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলেচে যে চলেচে-ই। তাছাড়া সব শান্ত, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েচে, আর জমাট বাঁধা ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মত দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লঙ্ঘ।

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠলো বলে আমুর মনের কুয়াশা কাটলো। সে ভরা চোখে তাকালো। ওপারের পানে — তারার পানে এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবলো, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখতো? কিন্তু সে তারাগুলোর নিচে ছিলো ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য, আর ময়ূরাক্ষী। আর এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েচে শুধু হিংসাবিদ্বেষ-নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা।

কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কি যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে — । কিন্তু যা এসেছিলো, মুহূর্তে তা সব শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেলো। কিছু নেই ...। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করচে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ-ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহুদূরে — কোথায় গো? যেখানে শান্তি — সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কী বিস্তৃত বালুচরের শান্তি?

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্থরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসচে গলি দিয়ে, এবং নদীর মত প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন এলো তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখলো যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলচে, আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতায় ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। হয়তোবা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয় তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলচে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিক্‌রে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই : ভয় করে না একটু-ও : বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমান। তাছাড়া, রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটি বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলো-রেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েচে, সে-আলো রেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুল্‌চে না তো যেন হাসচে : আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায় — তখন পথ চল্‌তি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোন অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসচে। কিন্তু কেন হাসবে? দীর্ঘ-উজ্জ্বল সে-রেখাকে তার ভয় নেই? জানেনা সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি — অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক আলাদা দুনিয়ায় হাসুক কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-দুনিয়ায় — যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে-ধারে পড়ে রয়েচে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, সে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না — দেবে না।

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসচে, শূন্যে ভাসতে-ভাসতে যেন এগিয়ে আস্‌চে ক্রমশ, এসে, কী আশ্চর্য, আলোরেখাটাও পেরিয়ে গেলো নির্ভয়ে, এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে-রেখা বাধা দিলো না তাকে। মৃতগতির-পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নামলো কুয়াশা আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নামলো। পরাজয় মেনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি।

রোদদগ্ধ দিন খরখর করে। আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা : শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। (এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা।) তবু ভালো।

ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কেমলতা, সে চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভংঙ্কর চোখ ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলচে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাড়ি কলা ঝুলচে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয় তো, যেন হলুদ রঙা স্বপ্ন ঝুলচে। ঝুলচে দেখে ভয় করে — নিচে কাদায় ছিঁড়ে পড়বে কী হঠাৎ? তবু, শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন উর্ধ্বপানে মুখ করে কেঁদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারা গাঁ?

লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্চে : রক্ত ছুটচে। যেমন করিম মিয়ার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিলো রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা শাদা, এত শাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্যে খাঁ খাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেলো রক্ত ঝল্‌কিয়ে। কিন্তু একটা কথা : ও কী ভেবেচে যে তার মাথায় সাজানো চুল তারই? আমু কী জানে না — আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল।

কিন্তু পথে কতো কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অগুনতি মাথা; কোন সে অজ্ঞাত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেচে শুধু ধানখেতে, হাওয়ায় দোলানো ধানের খেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে আর এতে কত তফাত। মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর আর দেহের সাথে জমির কোন যোগাযোগ নেই, যে হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্পমান, সে-হাওয়াও দিগন্ত থেকে ওঠে আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ হাওয়া নয় : এ-হাওয়াকে সে চেনে না।

অসহ্য রোদ। গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কি রকম কথা : ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসচে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরো বিরক্তিকর — এ কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোন লোক নেই। এখানে ইটের দেশে তো কেউ নেই-ই, তার দেশের যারা বা আছে তারাও মন হারিয়েচে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েচে অন্ধ চোখে চেয়ে।

তবু যাক, ভুতনি আসচে দেখা গেলো। কী রে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলে না, তার চোখ শুধু ড্যাব-ড্যাব করচে, আর গরম হাওয়ায় জটা পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করচে। কিন্তু কী রে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পমান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললে ভ্যাঁ করে। কেউ দিলো না বুঝি, পেট বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েচে কী জানিস, কোত্থেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে-ছিটাতে এসে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে গেলো, তার মাথায় আমাদের সেই ঝিরার মাথার চুল — তেমনি ঘন, তেমনি কালো...। আর তার গলার নিচেটা — । ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মত লেগে রয়েচে। থাক সে কথা। কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি? ভুতনি, ওরে ভুতনি?

কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করলো। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোন নতুন কথা নয় পুরোনো কথা শুধু আবার বলা হলো। সে মরেচে, ও মরেচে; কে মরেচে বা মরচে সেটা কোন প্রশ্ন নয়, আর মরচে মরেচে কথা দুরঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তায় দুধারের সারি-সারি বাড়ি — যে বাড়িগুলো অদ্ভূতভাবে অচেনা, অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোচে অবশ্য রয়েচে।

ভুতনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেলো। কাশি থামলে ভুতনি হঠাৎ বললে, পয়সা? তার পয়সার কথা-ই যেন শুধোচ্চে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন? ভুতনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করচে, আর কিছু কিছু জ্বলচে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতনি আরো কাঁদলো, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে আমুর চোখ জ্বলে উঠলো। চোখ যখন জ্বলে উঠলো তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ : একটা বিদ্রোহ — একটা ক্ষুরধার অভিমান ধাঁ ধাঁ করে জ্বলে উঠলো সারা দেহময়। তাতে তবু কেমন যেন প্রতিহিংসার উজ্জ্বলন্ত উপশম।

সন্ধে হয়ে উঠচে। বহু অচেনা পথে ঘুরে ঘুরে আমু জানলে যে ও-পথগুলো পরের জন্যে, তার জন্য নয়। রূপকথার দানবের মত শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ-চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপচে। কোন সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ-উদগ্র ব্যস্ততা? সে গুহা কী ক্ষুধার? এবং সে-গুহায় কী স্তূপীকৃত হয়ে রয়েচে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? কত বৃহৎ সে গুহা?

অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে ধীরে কথা কয়ে উঠচে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ-বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠছে তা। কী কইচে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে-অস্পষ্টতা অতি উগ্র : মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হলো : রূপকথার সন্ধ্যা-ও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেচো? কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটবো, চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে-আকাশ দিয়ে — কে তুমি, তুমি কে?

আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মত। সে ক্ষমা চায় : শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে-ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করেচে, এবং তাই সে ক্ষমতা চায় : দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চারধারে তো রাত্রির ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ, শুন্‌বে না কেউ।

ওধারে কুকুরে-কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেচে। মনের এ-পবিত্র সান্ত্বনায় সে কোলাহলের তীক্ষ্ম আওয়াজ অসহনীয় মনে হলো বলে হঠাৎ আমু দূর দূর বলে চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর জানলো যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়। অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।

কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে-বাইরে মানুষ। সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠে পড়লো, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধানে যেন তাকালো রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দুপাশের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর পানে। একতলা দোতলা তেতলা — আরো উঁচুতে স্বল্পালোকিত জানালা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে! তুমি কী ওখানে থাক?

তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগলো। এবং কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বাষ্ঢ় হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ। আমু শুনতে পারচে বেশ যে, কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে আস্‌চে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেলো তখন তার আঘাতে অন্ধকারে ঢেউ জাগলো, ঢেউগুলো দু-ধারের খোলা-চোখে — ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো তার কানে। — মা গো, চাট্টি খেতে দাও —

এই পথ, ওই পথ : এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌঁছানো যায় না। ঘর দেখা গেলে-ও কিছুতেই পৌঁছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা ঝনঝন করে : কিন্তু এধারে কাচ, কাচের এপাশে মাছি আর পথ আর আমু। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটিলোক বাজের মত খাঁইখাঁই করে তেড়ে এলো। আরে, লোকটি অন্ধ নাকি? মনে মনে আমু হঠাৎ হাসলো একচোট, অন্ধ না হলে অমন করবে কেন? দেখতে পেতো না যে সে মানুষ?

পথে নেমে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিলো শহরের লোকেরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্যে নকল চোখ পরে। দোকানের লোকটি অন্ধ-ই, আর তার চোখে সে-নকল চোখ। কিছু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেচে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিলো অমন করে। কিন্তু সে কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কান্ড দেখে, নকল চোখে আর আসল চোখে তফাত নেই কিছু।

তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগলো। ময়ূরাক্ষীর তীরে কুয়াশা নেমেচে। স্তব্ধ দুপুর : শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতাল ঝন ঝন করচে, আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়চে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেচে, আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েচে।

কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগচে। কী কোলাহল। লোকেরা আসচে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে, তবে নকল চোখ পরা কোন অন্ধ তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না তো খাঁই খাঁই করে? কিন্তু গন্ধটা চমৎকার। তারপর বোশেখ মাসে শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি দেখতে না দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভেতরটা করাল হয়ে উঠলো, আর কাঁপতে থাকলো সে থরথর করে : সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইলো দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে চেঁচিয়ে উঠলো, আরেকজন দ্রুত পায়ে এলো এগিয়ে, এসে হীন ভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগাল দিয়ে উঠলো। এই জন্যেই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিলো। হঠাৎ সে ক্ষিপ্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর, এবং তারপর চকিতে-ঘটিত বহু ঝড়-ঝাপটার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে পথ ধরলো, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলো : যে-লোকটা তাড়া করে এসেছিলো সে-ও যদি ময়রার দোকানের লোকটার মত অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সে-ও অন্ধ, তার-ও চোখ নকল ; শহরে এত-এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর।

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পর উত্তেজিত মাথা ঠান্ডা হতে সময় নিলো। এবং সে উত্তেজনার মধ্যে কোন রাস্তা হতে কোন কোন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে হঠাৎ এক সময়ে সে থমকে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে ভাবলো : যে পথের শেষ নেই, সে পথে চলে লাভ নেই, বরঞ্চ ওই যে ওখানে কে কঁকাচ্চে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কী হয়েচে তার। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্ট, তার তলে আবছা অন্ধকারে কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে আর পেটে হাত চেপে দুরন্ত বেদনায় গোঙাচ্চে। তার একটু তফাতে যে ক'টা লোক উবু হয়ে বসে রয়েচে তাদের মুখে কোন সাড়া নেই, শুধু তারা নিঃশব্দে ধুঁকচে। আমু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আপন মনে থমকে ভাবলো, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে কেন যাবে তাদের কাছে। যাবে না। তারপর কেমন একটা চাপা ভয়ে সে যেন ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে চললো। কী যে সে-ভয় সে-কথা সে স্পষ্ট বলতে পারবে না, এবং সে-কথা জানবারও কোন তাগিদ নেই, শুধু যে কেমন একটা ভয় কালো ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেচে তার সারা অন্তর, সে ভয় হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে পালিয়ে যাবে সে-রাস্তা দিয়েই, যে-রাস্তার কোন শেষ নেই। যে-ছায়া ঘনিয়েচে মনে তারও কী শেষ নেই? আর, সে-ছায়া কী মৃত্যুর?

অনেক্ষণ পর তার খেয়াল হলো যে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েচে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠচে ওপরের পানে, এবং যখন সে-আর্তনাদ শূন্যতায় মুক্তি পেলো, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেল, অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনালো তা। এ কী তার গলা — তার আর্তনাদ? সে কী উন্মাদ হয়ে উঠেচে? অথবা কোন দানো কী ঘর নিয়েচে তার মধ্যে? তবু, তবু, তার মনের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মত গলা বেয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র বীভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগলো, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগলো আপাদমস্তক। অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপলো, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো, এসে অতি আস্তে আস্তে অতি শান্তগলায় শুধু বললে : নাও।

কী? কী সে নেবে? ভাত নেবে। ভাতই কী সে চায়? সে ভাতই চায় : এ দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। ত্রস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিয়ে, মুখ তুলে কয়েকমুহূর্ত নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলো মেয়েটির পানে। মনে হচ্ছে যেন চেনা চেনা। না হলে সে চোখ ফেরাতে পারবে না কেন।

— নয়নচারা গাঁয়ে কী মায়ের বাড়ি?

মেয়েটি কোন উত্তর দিলে না। শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েক-মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

◆ ◆

বস্তুসংক্ষেপ

মহামন্বন্তরে খাদ্যের আশায় বাস্তুত্যাগী মানুষের স্রোত ধরে নয়নচারা গ্রামের আমু শহরে এসেছে। দুর্ভিক্ষের আক্ষরিক অর্থ এই শাহরিক জীবন ও সমাজের এক রূঢ় বাস্তবতা। খাদ্যের অন্বেষণে আমু দিনভর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ক্ষুৎ পিপাসায় অবসন্ন আমু ব্যর্থ মনোরথ হয়েই ফিরে আসে অনিবার্য মৃত্যুমুখী মানুষের স্রোতে। শহর-সভ্যতার নিষ্ঠুর রূপের বিপরীতে ক্ষুধায় অবসন্ন আমুর অবচেতনায় ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী মধুময়-প্রাণময় নয়নচারা গ্রামের স্মৃতির জাগরণ ঘটে বারবার।

শহরবাসী আত্মকেন্দ্রিক মানুষের নিত্য চলাচলে মুখর থাকে রাজপথ; কিন্তু বাস্তুহারা নিরন্ন মানুষের দিকে ভ্রূক্ষেপ করার অবসর নেই তাদের। শহরের ইট-কাঠ-প্রস্তরের মতই এরা সব মমতাহীন-প্রাণহীন। নয়নচারা গ্রামে কুকুরের চোখে যে বৈরিতা দেখেছে আমু শহরের মানুষের চোখে লক্ষ্য করেছে সে ঐ-বৈরিতা।

ময়রার দোকানে মাছি ভন-ভন করে। চোখময় পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে দোকানে বিরাজ করে ময়রা। ওধারে একটি দোকানে ক-কাড়ি কলা হলুদ-রঙা স্বপ্ন হয়ে ঝোলে। লালপেড়ে শাড়ি পরা একটি মেয়ে পথচারি আমুকে দুটো পয়সা দিয়ে রক্ত ঝলকিয়ে চলে যায়। মেয়ের মাথার সাজানো চুল মেয়েটিরই কিনা ভেবে সংশয়িত হয়ে পড়ে আমু। তার মনে হয় ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে — ঝিরার মাথার ঘন চুল।

আমুর প্রতিবেশী ভুতনির ভাই ভুতো অনাহারে মারা যায়। ভুতনির কাশির প্রকোপ কমে না। ক্ষুধার্ত ভুতনি শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসে শূন্য হাতে। 'রক্ত ছিটাতে ছিটাতে দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেলো' যে মেয়েটি, আমু তার কথা

ভুতনির কাছে বলে। মেয়েটির মাথার চুল যে নয়নচারা গ্রামের ঝিদের চুলের মতন ঘন-কালো — সে-কথাও বলতে ভোলে না আমু। একদিকে শহরের দৃশ্যমান বাস্তব আর অন্যদিকে স্বপ্নময় অবচেতনময় অন্তর্বাস্তবতানিষ্ঠ নয়নচারা গাঁয়ের ছিন্ন ছিন্ন স্মৃতির সূত্রে আলোড়িত হয়ে ওঠে আমুর মনোলোক। তবু দুর্ভিক্ষ-তাড়িত আমু ভিক্ষালব্ধ দুটো পয়সা ক্ষুধার্ত ভুতনি হাত পেতে চাইলেও বাস্তবিক কারণেই দিতে পারে না। একটা বিদ্রোহ আর ক্ষুরধার অভিমান ধাঁ ধাঁ করে জ্বলে ওঠে তার সমগ্র দেহে। সন্ধ্যা নামে। বহু অচেনা পথে ঘুরে-ঘুরে আমু বুঝতে পারে ও পথগুলো তার জন্য নয়। নীড়-অভিমুখী মানুষের চলাচলে চঞ্চল শহরের রাস্তাগুলো। আমুর মনে হয় কোন্ সে গুহায় ফিরে যাবার জন্য মানুষের এত উদগ্রতা। সে গুহায় কী স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ?

আমুর ক্ষুধা-অবসন্ন সমস্ত মন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, অনুতপ্ত অপরাধীর মতো নুয়ে পড়ে তার সমস্ত শরীর। অন্নের ভাঁড়ার আগলে আছে যে শক্তিমান, তার কাছে ক্ষমা চায় আমু। দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক।

ওধারে কুকুরে কুকুরে বিবাদ বেঁধেছে। প্রথমে দূর দূর বলে চেঁচিয়ে উঠলেও পরে সে বুঝতে পারে বিবাদমান কুকুরগুলো আসলে কুকুর নয়, ক্ষুধায় হিংস্র জান্তব মানুষ। কিন্তু আমু কুকুর নয়, ভেতরে-বাইরে মানুষ। সে ক্ষমা প্রার্থী। অদূরবর্তী সারিবদ্ধ দালানের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে সম্ভাব্য অন্নদাতা শক্তিশালীর অবস্থান রয়েছে কিনা জানতে চায় সে। আমুর পথচলার বিরাম নেই। কাছে পিঠেই ঘরের সমাহার, কিন্তু অনিকেত আমুর পক্ষে ঘরে পৌঁছানো যাবে না কখনো। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে। কাচের ওধার থেকে দেখা যায় মানুষের আনাগোনা-খানাপিনা। কিন্তু কাচের ওপাশে মাছি, পথ আর ক্ষুধার্ত আমুর অবস্থান। রাস্তায় দাঁড়ানোরও উপায় নেই তার। বাজখাঁই গলায় তেড়ে আসা লোক হটিয়ে দেয় মানুষ-আমুকে।

আবার শুরু হয় পথচলা। শহরের এই রূঢ় নিষ্ঠুর রূপের বিপরীতে মনের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত নয়নচারা গ্রামের ছবি জেগে ওঠে আমুর ভাবনায়। দুর্ভিক্ষপীড়িত নয়নচারার মৃত্যু-গহ্বর অতিক্রম করে এসেছে সে। মৃত্যুহীনতার সদর-রাস্তায় উত্তীর্ণ আমুর এখন আর মৃত্যু-ভয় নেই।

এ পথে ও পথে হাঁটতে-হাঁটতে ভোজন উৎসব-বিলাসী মানুষের তাড়া খেয়েও পথ হারা হয় না আমু। একবার ভাবে যে পথের শেষ নেই, সে পথে চলা নিরর্থক। এই ভেবেই সে পৌঁছে যায় মৃত্যুমুখী মানুষের ভিড়ে কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে আসে আমু। তার মনে হয়, মৃত্যুকে আলিঙ্গনের অপেক্ষায় যারা নিঃশব্দে ধুঁকছে, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। ফলত দ্রুত পা চালিয়ে অবসন্ন মানুষের মৃত্যুপুরী থেকে পালিয়ে আসে আমু। পুনরায় শুরু হয় তার পথ চলা।

অনেক্ষণ পর আমুর খেয়াল হয় যে, সে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে চলেছে। গলার সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠে আসা আর্তনাদ নিজের কাছেই ভয়ঙ্কর শোনালো তার। অবশেষে একটানা ভয়ঙ্কর বীভৎস আর্তনাদে প্রাণ কাঁপলো আবদ্ধ দরজার। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো কে একটা মেয়ে, অতি-আস্তে শান্ত গলায় শুধু বললে — 'নাও'।

কী নেবে আমু? আমু ভাতই চায়। অস্তিত্বকে রক্ষা করে যে ক্ষুধার অন্ন, সে অন্ন ছাড়া আর কিছুর নাম জানে না আমু। ত্রস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে ভাতটুকু নেয়ার মুহূর্তগুলিতে নিস্পলক চোখে বিস্ময়াভিভূত আমু চেয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। চেনা-চেনা মনে হয় তার মেয়েটিকে। নতুবা চোখ ফেরাতে পারবে না কেন সে? আবিষ্কারের আনন্দে অভিভূত আমু জিজ্ঞাসা করে 'নয়নচারা গাঁয়ে কী মায়ের বাড়ি?' স্বভাবতই মেয়েটি কোন উত্তর দেয় না; শুধু কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়মাখা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দরজা বন্ধ করে দেয়।

শহরের প্রাণহীন রুক্ষতার মাঝেও যে নারী ক্ষুধার্তের হাতে অন্ন ঢেলে দেয়, তার অবয়বে ভঙ্গিমায় আমু প্রত্যক্ষ করে মমতামাখা নয়নচারা গ্রামের মা-ঝিদের অন্নদাত্রী-রূপিণী নারী-রূপ!

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. দেহের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েও জাগ্রত মন নিয়ে কোথায় পরিভ্রমণ করে আমু?

২. 'সে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না — দেবে না।' কাকে হাসতে দেবে না আমু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৩. রাজপথে ভাসমান দুর্ভিক্ষতাড়িত নিরন্ন মানুষের অবস্থা বর্ণনা করুন।

৪. শক্তিশালী কে ? শক্তিশালীর কাছে আমুর ক্ষমা প্রার্থনার হেতু কী?

৫. শহর ও শহরের মানুষ সম্পর্কে আমুর উপলব্ধি বর্ণনা করুন।

৬. আমুর আত্মভাবনার আলোকে নয়নচারা গ্রামের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

দুর্ভিক্ষপীড়িত আমু ক্ষুধার অন্নের আশায় গ্রাম পরিত্যাগ করে শরণার্থী হয়েছে শহরে। বাস্তুহারা ক্ষুধার্ত আমু দুমুঠো ভাতের আশায় নির্দয় শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। লঙ্গরখানা থেকে দেয়া অপ্রতুল খাদ্যে ক্ষুধা মেটেনা আমুর। খাদ্যান্বেষণে বৃথাই শহর প্রদক্ষিণ করে অন্যদের মত ক্লান্ত অবসন্ন দেহ আমু ফুটপাতে এলিয়ে পড়ে। অন্যরা ঘুমিয়ে পড়লেও আমুর চোখে ঘুম আসে না। কখনো কখনো তন্দ্রার কুয়াশা নামে তার চোখে। যদিবা কখনো ঘুম আসে, সে ঘুম তার মনোলোকে ভর করতে পারে না। দেহের ঘুমে আচ্ছন্ন হলেও জাগ্রত মন নিয়ে সে ফেলে আসা স্মৃতিময় নয়নচারা গ্রামে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। ঘনায়মান অন্ধকার রাতে জনশূন্য রাজপথকে প্রিয় ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে ভালো লাগে তার। মনের চরে যখন আঘাত করে ঘুমের বন্যা তখন তার মনোলোকে কলস্বরা ময়ূরাক্ষী জীবন্ত হয়ে ওঠে, নদীর মধ্যজলে ভাসমান জেলে ডিঙিগুলোর বিন্দু বিন্দু লালচে আলো আশার প্রদীপ হয়ে মৃদু-মৃদু জ্বলে। তার অবচেতনায় ময়ূরাক্ষীর জেলে ডিঙিগুলোর খোদল বড়-বড় চকচকে মাছে পূর্ণ হয়ে যায়।

শহরের নির্দয়তার বিপরীতে, স্মৃতিময় নিরাপদ নয়নচারা গাঁ আশা ও প্রশান্তির প্রতীক হয়ে বিরাজ করে আমুর মনোলোকে। এ জন্যেই অবসন্ন দেহে ঘুম ভর করলেও অবচেতন অবস্থায় আমুর সংবেদনা নয়নচারা গাঁ-কে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

৪ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা- উত্তরঃ

উদরে প্রজ্বলিত ক্ষুধার আগুন নিয়ে শহরের রাজপথে ভাসমান আমু অনুধাবন করতে পেরেছে শক্তিহীন জনারণ্যের বিপরীতে খাদ্যের ভাঁড়ার আগলে থাকা শক্তিমানের অস্তিত্ব। ময়রার দোকানে ধাতব মুদ্রার ঝনৎকারে, শোভার জন্য নকল চোখ পরা মানুষের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে শক্তিশালী। মহামন্বন্তরে কৃত্রিম খাদ্য-সংকটের হোতা শহরের বর্ণচোরা শক্তিশালী মানুষ।

রাতের অন্ধকারে আমু দেখতে পায় শয়তানের প্রজ্বলিত চোখ। আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায় তখন শয়তানের চোখে আগুন জ্বলে ওঠে হাসির প্রতিমায়। হৃদয়জ ক্রোধে-ঘৃণায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আমুর মন। কালো নদীর ধারে ধারে পড়ে রয়েছে যে-সব মানুষ ভাটির টানে মৃত্যুস্রোতে ভেসে যাবে বলে সে-দুনিয়ায় শয়তানকে কোনো অবস্থাতেই হাসতে দেবে না আমু। কিন্তু আমুর এই আপাত বিদ্রোহ ক্ষুধার পীড়নে ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ে। সে যদিও বলে 'কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটবো, চেটে চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাবো সে-আকাশ দিয়ে — কে তুমি, তুমি কে?' তবু শেষ অবধি ক্ষুধা অবসন্ন আমুর সমস্ত মনে স্তব্ধতা ভিড় জমায়, অনুতপ্ত অপরাধীর মত নুয়ে পড়ে সে। অসহায় নিরন্ন জনতার প্রতিনিধি আমু নগর-সভ্যতার কূটচালের রহস্য ভেদ করতে পারে না, কৃত্রিম সংকটের মারণান্তিক রূপের শিকারই হয় কেবল। এ-জন্যেই আমু শক্তিশালীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। সে জানতে পেরেছে শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সেই গর্হিত ন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করা ক্ষমাহীন পাপ। অসহায় আমু উপলব্ধি করে যে সে পাপ করেছে। এই পাপ-মুক্তির জন্যই সে শক্তিশালীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। দুটি ক্ষুধার অন্ন দান করে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। শহরে অনেক মানুষ রয়েছে যারা বাইরের মানুষ অথচ ভেতরে কুকুর। আমু ভেতরে বাইরে অবিমিশ্র মানুষ। সে-জানে আশেপাশের সারিবদ্ধ-ত্রিতল দ্বিতল দরদালানের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর ভেতরেই খাদ্যের ভাঁড়ার আগলে থাকা শক্তিশালীর অবস্থান।

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা।
২. যে দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে-ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, সে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না — দেবে না।
৩. শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। (এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা)।
৪. অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অ-গুণতি মাথা : কোন-সে অজ্ঞাত হাওয়ায় দোলায়িত এ কালো রঙের সাগর।
৫. ....তারপর জানলো যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।
৬. ... এই পথ, ওই পথ : এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌঁছানো যায় না।
৭. ... ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, সে কেন যাবে তাদের কাছে।

৩ নং ব্যাখ্যার নমুনা- উত্তরঃ

আলোচ্য গল্পাংশটুকু বিশিষ্ট কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'নয়নচারা' গল্পের অন্তর্গত। উদ্ধৃত অংশে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমুর উপলব্ধিতে গ্রামের তুলনায় প্রাণহীন শহরের অন্তঃসারশূন্য অমানবিক রূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

মহামন্বন্তরে খাদ্যের অন্বেষণে নয়নচারা গ্রাম পরিত্যাগ করে আমু শরণার্থী হয়েছে নির্দয় শহরে। প্রস্তরময় শহরের নির্দয় মানুষের উপেক্ষা আর প্রত্যাখ্যানে আমু এবং রাজপথে ভাসমান অগণিত মানুষের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। শহরের নির্দয় রূপের বিপরীতে স্নেহ-মমতায় নয়নচারা গ্রামের ছবি চেতনে-অবচেতনে জেগে ওঠে আমুর মনোলোকে। অবসন্ন আমু আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবে ঐ তারকারাজির নিচেই ছিলো নয়নচারা গাঁয়ের মাঠ-মাটি-ঘাস-শস্য আর প্রবহমান ময়ূরাক্ষী। অথচ ঐ অভিন্ন তারাগুলোর নিচেই বিরাজ করছে শাহরিক জীবনের নিষ্ঠুরতা। এখানে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, আছে হিংসা, নিষ্ঠুরতা, বৈরিতা। এখানে ক্ষুধার অন্নের ভাঁড়ার আগলে রাখে ছদ্মবেশী শক্তিমান। গ্রামের শান্ত স্নেহ ভালোবাসা-মমতা-সহানুভূতিতে পূর্ণ পরিবেশে হিংস্র কুকুরের চোখে যে বৈরিতা প্রত্যক্ষ করেছে আমু অবিকল সেই বৈরিতাই সে আবিষ্কার করেছে শহুরে মানুষের দৃষ্টিপাতে। শহরে কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই; পশুর জান্তব প্রকৃতি অধিকার করে মানুষই হয়ে উঠেছে এক-একটি কুকুর।

আমুর এই উপলব্ধির মধ্যদিয়ে গত্মকার মহাদুর্ভিক্ষের এক হিংস্র অমানবিক রূপকে জীবন্ত করে তুলেছেন। দুর্ভিক্ষে-মন্বন্তরে কৃত্রিম সঙ্কটের হোতা মানবতা বিরোধী চক্র কীভাবে পাশবিক মূর্তিতে আবির্ভূত হয়, তারই প্রকাশ ঘটেছে নগরে আগত এক উদ্বাস্তুর সরল উপলব্ধির স্পর্শে।

৪নং ব্যাখ্যার নমুনা- উত্তরঃ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'নয়নচারা' গল্প থেকে উদ্ধৃত বাক্যটি সংগৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমুর দৃষ্টিকোণ থেকে শহরের রাজপথে ভাসমান মানুষের অবস্থানের চিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পকার।

খাদ্যের অন্বেষণে দুর্ভিক্ষপীড়িত আমু শহরে এসে গ্রামছাড়া অগণ্য উদ্বাস্তু মানুষের কাতারে মিলিত হয়েছে। শহরের নিষ্ঠুর নির্দয় রূপের তুলনায় স্নেহ-মমতা মাখা স্মৃতিময় স্বগ্রাম 'নয়নচারা' আমুর চেতন-অবচেতন মনোলোকে জেগে ওঠে বারবার। কালো পিচঢালা পথে অসংখ্য মানুষের স্রোত; ওপরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে কেবল অদ্ভুত চাঞ্চল্যমুখর গণনাতীত কালোচুলের মাথা। আমুর মনে হয় অজ্ঞাত হাওয়া দোলায়িত এ-এক কালো রংয়ের সাগর। হাওয়ায় আন্দোলিত এমন সাগর আমু দেখেছে 'নয়নচারা' গ্রামের ধানক্ষেতে। তবু এ-দুয়ের তফাৎ অস্পষ্ট থাকেনা আমুর উপলব্ধিতে। এখানে মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর যে অজ্ঞাত হাওয়া এসে আন্দোলন তুলেছে মানুষের দেহে, সে হাওয়াও দিগন্ত থেকে উঠে আসা সবুজ শস্য কাঁপানো বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ হাওয়া নয়। এ-হাওয়া দুর্ভিক্ষের বিষবাষ্পে দূষিত-কলুষিত। বৃক্ষছায়াহীন খরতাপে দগ্ধ উষর পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠা আমুর উপলব্ধিতে স্মৃতিময় গ্রামের বিপরীতে জান্তব শহরের অন্তঃসারশূন্য রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমুর গ্রামকেন্দ্রিক অনুভবনিষ্ট অন্তর্বাস্তবতা আর শাহরিক জীবনের দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত বহির্বাস্তবতার সমন্বয় ঘটেছে আলোচ্য অংশে। এর মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন শস্যশ্যামল গ্রামের শান্তশ্রী রূপ স্মৃতিঅনুষঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি তুলনার প্রতিসাম্যে মন্বন্তরক্লিষ্ট শহরের বিষাক্ত মূর্তিচিত্ত জীবন্ত অবয়ব পেয়েছে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আমুর অবচেতন মনের অনুভূতিগুলো নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

২। 'নয়নচারা' গল্প অবলম্বনে শহরে সমাগত উন্ম লিত মানুষের অবস্থার পরিচয় দিন।

৩। আমুর দৃষ্টিকোণ থেকে শহর ও গ্রাম এবং ধনী ও নিঃস্বের তফাৎ ব্যাখ্যা করুন।

৪। 'নয়নচারা' গাঁয়ে কী মায়ের বাড়ি?' — আমুর এ-জিজ্ঞাসার তাৎপর্য বিশেষণ করুন।

৫। 'নয়নচারা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৪ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা- উত্তরঃ

বিশিষ্ট কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউলাহ্ রচিত 'নয়নচারা' বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মহামন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা এই গল্পটিতে গ্রামের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে খাদ্যের অন্বেষণে শহরে আগত শরণার্থী মানুষের হাহাকার এবং তার বিপরীতে নির্দয় নিষ্ঠুর শহরবাসীর উদাসীনতা, যান্ত্রিকতা এবং সভ্যতাবিরোধী অমানবিকতা শিল্পরূপ লাভ করেছে। একদিকে সর্বজ্ঞ লেখক অন্যদিকে সুখ-স্মৃতিময় 'নয়নচারা' গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে আগত আমুর দৃষ্টিকোণ ও অনুভবময়তায় দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত নগরজীবনের রূঢ় বাস্তবতা রূপ লাভ করেছে গল্পটিতে।

খাদ্যের অন্বেষণে শহরের পিচঢালা রাজপথে ভাসমান ছিন্নমূল আমুর চোখে শহরবাসীর রূঢ়তা নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাগরিক জীবনের এই নির্দয় বাস্তবতার বিপরীতে চেতনে-অবচেতনে আমুর মনোলোকে ভিড় করে স্নেহ-মায়া-মমতা-মাখানো 'নয়নচারা' গাঁয়ের মধুর স্মৃতি। ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাজপথকে তার প্রিয় ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে ভালো লাগে। ময়ূরাক্ষীতে ভাসমান জেলে ডিঙিগুলোর বিন্দু বিন্দু লালচে আলো আশার প্রদীপ হয়ে আমুর মনোলোকে জ্বল-জ্বল করে। ক্ষুধায় অবসন্ন আমুর দেহে যখন ঘুম নামে তখন তার জাগ্রত মন পরিভ্রমণ করে চেনা নদীর ধারে; নদীর মৃদুকলস্বর আর চক্‌চকে্ মাছে পরিপূর্ণ জেলেডিঙিগুলোর চলাচলে আমুর মানসভ্রমণ সন্ধান করে লুপ্ত সুখ ও প্রশান্তি। এরই সূত্রে শহরের অমানবিক নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার পটভূমিকায় আমু তার জাগরচৈতন্যে যখন শাহরিক ব্যক্তিমানুষের আচরণে মানবিকতার মৃদু স্ফুরণ প্রত্যক্ষ করে, তখনই তার মধ্যে আবিষ্কার করে সে স্নেহ-মমতায় নয়নচারা গাঁয়ের প্রতিভাস। আমুর উপলব্ধির এই সরল সমীকরণই প্রশ্নোক্ত জিজ্ঞাসার মর্মে নিহিত রয়েছে।

ক্রমে ক্রমে আমুর উপলব্ধিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সভ্যতাগর্বী নগরসভ্যতার অন্তঃসারশূন্যরূপ। পথের শেষ নেই জেনেও পথে-পথে পরিভ্রমণ করে আমু বুঝতে পেরেছে ক্ষুধার অন্নের ভাঁড়ার আগলে থাকা নিভৃত আত্মগোপনকারী শক্তিশালী শাহরিক মানুষ আমুদের বাচঁতে দেবে না। রাজপথে ভাসমান অগণ্য মানুষ মৃত্যুমুখী পথেই আত্মসমর্পণ করে নিরুপায় হয়ে। কিন্তু অস্তিত্বসতর্ক জীবনপিপাসু আমু উপেক্ষা করে মৃত্যুর আহ্বান। রাতের অন্ধকারে জ্বলে ওঠা শয়তানের চোখে হীনতা-ক্ষুদ্রতার দ্যুতি প্রত্যক্ষ করেও আমুর আত্মভাবনায় দৃঢ়তা পায় প্রতিরোধের প্রত্যয়;

'... এ দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে-ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, সে দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবেনা — দেবেনা।'

যদিও আমু গ্রামের কুকুরের হিংস্রতা প্রত্যক্ষ করেছে শহুরে মানুষের চোখে, পসার সাজিয়ে বসা ময়রার চোখে দেখেছে পাশবিক হিংস্রতা; তবু লালপেড়ে শাড়ি পরে রক্ত ঝলকিয়ে যে মেয়েটি ভিক্ষাপ্রার্থী আমুর দিকে দুটো পয়সা ছুড়ে ফেলে দ্রুত চলে যায় — তার মাথার চুলে আমু দেখে নয়নচারা গাঁয়ের মা-ঝিদের চুলের আদল। নারীর কল্যাণী মূর্তি নয়নচারা গাঁয়ে প্রত্যক্ষ করেছে আমু। শহরের অমানবিকতার পঙ্কস্রোতে আকস্মিক দানের প্রসারিত হাতকে তাই নয়নচারা গাঁয়ের কল্যাণীমূর্তির প্রসারিত হাত বলে তার ভ্রম হয়।

রাজপথে ভাসমান অসংখ্য মানুষের কালো মাথার আন্দোলন কালো রঙের সাগর বলে মনে হয় আমুর। মৌসুমী হাওয়ায় ধানক্ষেতে শস্যের আন্দোলন দেখেছে আমু। কিন্তু এখানকার দূষিত হাওয়ার আন্দোলনের সঙ্গে তার কতইনা তফাৎ। এ-দেশ প্রাণহীন ইটের দেশ, এখানে মন নেই, অনুভূতি নেই,আছে অনন্ত ক্ষুধা। এই ক্ষুধার পীড়ন থেকে মুক্তি চায় আমু। সে জানে পাশ্ববর্তী দ্বিতল-ত্রিতল বাড়ির স্বল্পালোকিত জানালার আড়ালে শক্তিশালীর অবস্থান — যে ক্ষুধার অন্নের ভাঁড়ার দখল করেছে। উপায়হীন অবসন্ন আমু অনুতপ্ত অপরাধীর মতো শক্তিমানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। সে জানে শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়। শক্তিশালী দুমুঠো ভাত দিয়ে তাকে ক্ষমা করুক। এই প্রার্থনা নিয়েই আমু যে-পথের শেষ নেই — সেই পথেই পা বাড়ায়। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, শব্দ ওঠে ধাতব মুদ্রার। কাচের ওপাশ থেকে দাঁড়িয়ে ভোজনবিলাসী মানুষের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু ওখান থেকেও তাড়া খেয়ে চলে আসতে হয়

আমুকে। রসনাবিলাসীর আহার্যের গন্ধে আর কোলাহলে মৌ-মৌ করে হোটেলের চারপাশ। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে যায় আমু। কিন্তু এখান থেকেও চকিতে ঘটিত বহু ঝড়-ঝাপটার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে ফিরে আসতে হয় আমুকে। তবু মৃত্যুস্রোতে আত্মসমর্পণ করবে না আমু। নিঃসাড় দেহে নিঃশব্দে যারা ধুকেছে — "ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, সে কেন যাবে তাদের কাছে। যাবে না।"

কাজেই মৃত্যুমুখী জনতার কাতার থেকে পালিয়ে জীবনমুখী পথের সন্ধানে পুনরায় পথচলা শুরু হয় আমুর। এক সময় আমু আবিষ্কার করে যে, সে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণপনে আর্তনাদ করে চলেছে। গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসা আর্তনাদ নিজের কাছেই ভয়ঙ্কর শোনালো তার। অবশেষে কেঁপে উঠলো বন্ধ দরজার আগল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। অতি শান্ত গলায় হাত প্রসারিত করে দিয়ে মেয়েটি শুধু বললো :'নাও'। ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে প্রত্যাশিত ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করে নেয়ার মুহূর্তে আমু নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল মেয়েটির মুখের দিকে। মেয়েটির আদল চেনা-চেনা মনে হলো তার । ফলে আবেগে ও আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছ্বসিত আমু জিজ্ঞাসা করে: ' — নয়নচারা গাঁয়ে কী মায়ের বাড়ি?' স্বভাবতই মেয়েটি কোন উত্তর করে না, বিস্ময়ের বিমূঢ়তায় কয়েকমুহূর্ত আমুর দিকে তাকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

অস্তিত্বের চরমতম সংকটের মুহূর্তে দয়ামায়াহীন বিশুষ্ক নগরে স্নেহময়ী অন্নদাত্রীর মূর্তিতে মেয়েটির আবির্ভাব — মুহূর্তেই আমুর চৈতন্যে জাগ্রত স্মৃতিময়-কল্যাণময় নয়নচারা গাঁয়ের ছবি ভেসে ওঠে। নয়নচারা গাঁয়ে আমু দেখেছে নারীর মাতৃরূপ,অন্নদাত্রীর ভূমিকায় নারীর কল্যাণী আদল আমুর কাছে নয়নচারা গাঁয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংলিপ্ত। মানবতাহীন, নিষ্ঠুর হৃদয়হীন শহরে নারীর অন্নদাত্রীরূপ আমুর কাছে এক বিরল অভিজ্ঞতা। ফলত বিভ্রান্ত হয়েছে আমু। বন্ধ দরজার সামনে একটানা আর্তনাদের প্রতিক্রিয়ায় অর্গল মুক্ত করে অন্নদান করেছে যে নারী — তার স্বরূপ জানার কোনো অবকাশই ছিল না আমুর। তবু উপলব্ধির সরলতায় ঐ নারীর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছে যে নয়নচারা গাঁয়ের মা-ঝিদের কল্যাণী-অন্নদাত্রী রূপের আদল।

গত্মকার অত্যন্ত নিপুণভাবে গল্পের উপান্তে উপস্থাপিত এই আবিষ্কারস্পর্শী জিজ্ঞাসা গ্রথিত করে দিয়ে কলুষিত নাগরিক সভ্যতার অমানবিক রূঢ়-নিষ্ঠুর রূপের বিপরীতে শান্তস্ত্রী গ্রামীণ জীবনের নিষ্কলুষ মানবতাস্পন্দিত অবয়বকে জীবনময় করে তুলেছেন।

পাঠ-৪

দুই মুসাফির

শওকত ওসমান

(১৯১৭-১৯৯৮)

উদ্দেশ্য

সমগ্র পাঠটি পড়ে আপনি —

- পরলোক থেকে ইহলোকে আগত দুই মুসাফির-এর আবির্ভাবকালীন পরিবেশ, প্রকৃতি ও যাত্রাপথের বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইহলোকে আগত দুই মুসাফির-এর পরিচয়পর্বের আলাপচারিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রথম মুসাফির লালন ফকীরের প্রতি গ্রাম্য জনতার ঔৎসুক্যের রহস্য বিশেষণ করতে পারবেন।
- দ্বিতীয় মুসাফির সোবহান জোয়ার্দার-এর প্রতি মানুষের বিদ্বেষ ও অনীহার কারণ বিচার করতে পারবেন।
- গল্পটির তাৎপর্য বিশেষণে সক্ষম হবেন।
- গল্পটির অন্তর্নিহিত আবেদনের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

লেখক-পরিচিতি

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি বর্তমান ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের হুগলী জেলার সবল সিংহপুর গ্রামে শওকত ওসমানের জন্ম। তাঁর পিতার নাম শেখ মুহম্মদ এহিয়া। শওকত ওসমানের পিতৃপ্রদত্ত নাম শেখ আজিজুর রহমান; তার লেখক-নামের দেশজোড়া পরিচিতির কারণে প্রকৃত নামটি অনেকেরই অজানা।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কলকাতার বিখ্যাত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৩৫ সনে আই.এ এবং ১৯৩৮ সনে বি.এ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে শওকত ওসমান এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে।

শিক্ষক হিসেবে চাকুরি-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও শওকত ওসমান কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়াটার ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে। তিনি কিছুকাল কাজ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ তথ্য মন্ত্রণালয়ে, শিক্ষকতা করেছেন বেসরকারী স্কুলেও। পরে কলকাতার ইন্‌স্টিটিউট অব কমার্সে যোগ দেন বাংলা ও অর্থনীতি — এই দুই বিষয়ের অধ্যাপক রূপে।

১৯৪৭ খিস্টাব্দের ১৪-১৫ আগস্ট ভারত-বিভাগ সম্পন্ন হলে শওকত ওসমান তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসেন। এখানে তাঁর চাকুরী জীবন শুরু হয় চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে শওকত ওসমান ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। ঐ কলেজে কর্মরত অবস্থায় ১৯৭২ সনে ৫৫ বছর বয়সে শওকত ওসমান চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর সুদীর্ঘ অবসর জীবনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সাহিত্যসাধনা ও সমাজসেবায়।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান এক বিশিষ্ট নাম। কলকাতা বাসকালীন সময়ে চলিশের দশকের প্রারম্ভেই সাহিত্যজগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। এ সময়েই তিনি রচনা করেন প্রথম উপন্যাস **জননী** (১৯৬৮ সনে প্রথম প্রকাশিত)। তাঁর প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস **বনি আদম** ১৯৪৩ সনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলায় সামরিক শাসনামলে কয়েকটি রূপক উপন্যাস রচনা করে শওকত ওসমান সুখ্যাতি অর্জন করেন। এ সময়ের রচনা **ক্রীতদাসের হাসি** (১৯৬২) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ছোট গল্প সৃজনের ক্ষেত্রেও শওকত ওসমান দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বেশ কিছু গল্প বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল সম্পদ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে সুদীর্ঘ অবসর জীবনে শওকত ওসমান সাহিত্য ও সমাজসেবার মাধ্যমে ক্রমশ পরিণত হন জাতির বিবেকে। এ সময়ে তাঁর সমগ্র কর্মকান্ডের উৎসে সক্রিয় ছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সৃজনশীল রচনার পাশাপাশি এ পর্যায়ে তিনি প্রভূত সংখ্যায় সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি ও ধর্ম বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রখর সমাজজ্ঞান, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও পরিহাসপ্রিয়তা এবং আরবি-ফারসি-উর্দু হিন্দি শব্দ-সহযোগে স্বকীয় রচনাশৈলী শওকত ওসমানের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নিরলস সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি-স্বরূপ শওকত ওসমান ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কারে। ১৯৬২ সনে বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। অতঃপর ১৯৬৬ সনে তিনি 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' এবং ১৯৬৭ সনে পাকিস্তান সরকারের 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮৩ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পদক' প্রদান করে তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি দেন। ১৯৯১ সনে শওকত ওসমানকে 'মাহবুবউলাহ ফাউন্ডেশন পুরস্কার' ও 'মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে ঢাকায় প্রায় বিরাশি বছর বয়সে কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের জীবনাবসান ঘটে।

শওকত ওসমান রচিত উলেখযোগ্য গ্রন্থ:

ছোটগল্প: পিঁজরাপোল (১৩৫৮), জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৩৫৮), সাবেক কাহিনী (১৯৫৩), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৭৪), জন্ম যদি তব বঙ্গে (১৯৭৫), মনিব ও তাহার কুকুর (১৩৯৩), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০)।

উপন্যাস: বনি আদম (১৯৪৩), জননী (১৯৫৮) ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগত (১৩৭৪), জাহান্নাম হতে বিদায় (১৯৭১), রাজা উপাখ্যান (১৩৭৭), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৩৮০), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), জলাংগী (১৯৮৬)।

নাটক: আমলার মামলা (১৯৪৯), বাগদাদের কবি (১৩৫৯), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)।

শিশু সাহিত্য: ওটেন সাহেবের বাংলো (১৯৪৪), প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৯), ক্ষুদে সোশালিস্ট (১৯৭৩)।

প্রবন্ধ: সমুদ্র নদী সমর্পিত (১৯৭৩), সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬)।

পাঠ-পরিচিতি

শওকত ওসমান রচিত শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে 'দুই মুসাফির' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দুজন মৃত মানুষের মর্তলোকে আগমনকে উপলক্ষ করে গত্মকার গল্পটিতে রূপক ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। ইহজাগতিক জীবনের গৌরব যে একজন মানুষকে যুগপরম্পরায় লোকমানসে জীবন্ত করে রাখে। — এই বাণীই কবি লালন ফকিরকে কেন্দ্র করে দুই মুসাফিরের রূপকে গল্পটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত্মকারের মানবপ্রেম ও ইহজাগতিক চেতনা গল্পটির বড় সম্পদ।

'দুই মুসাফির' শওকত ওসমানের অন্যতম গল্পগ্রন্থ **প্রস্তর ফলক** -এর অন্তর্ভুক্ত প্রথম গল্প। ঢাকার এ.বি পাবলিকেশন্স থেকে ১৯৬৪ সনের আগস্ট মাসে **প্রস্তর ফলক** গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'দুই মুসাফির' গল্প দুটি অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশে সর্বজ্ঞ গত্মকারের ভাষ্যে মূল কাহিনী-অংশ উপস্থাপিত হয়েছে, দ্বিতীয় অংশে পরলোক থেকে আগত কবি লালন ফকির ও ভূস্বামী জোয়ার্দারের মধ্যে বিনিময়কৃত সংলাপ গুচ্ছ সংযোজিত হয়েছে। ঐ সংলাপ-অংশই গল্পটির ক্লাইম্যাক্স কিংবা শীর্ষচূড়া। সর্বজ্ঞ গত্মকারের বিবৃতিতে ও চরিত্রসমূহের সংলাপে গৃহীত হয়েছে চলিত ভাষারীতির গদ্য। আরবি-ফারসি শব্দ সহযোগে শওকত ওসমানের গদ্যরচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি আলোচ্য গল্পটিতেও সুলভ। বিষয়ের প্রতি আসক্ত ও আসক্তিশূন্য দুই মুসাফিরের পার্থক্য সূত্রে নির্মোহ কবির কালজয়ী মাহাত্ম্যের কথা গল্পটির মুখ্য বিষয় হওয়ায় এর 'দুই মুসাফির' নামকরণ সার্থক হয়েছে।

মূলপাঠ

গ্রীষ্মের দুপুর প্রায় শেষ। অড়হর ক্ষেতে ছায়া পড়ছে। ক্রমশ: দীর্ঘতর। কুষ্টিয়া জেলা বোর্ডের সড়ক-পথে একজন পথিক হাঁটছিলেন। পরণে গেরুয়া তহ্বন্দ্, গায়ে গেরুয়া আলখেলা। লম্বাটে মুখ-বোঝাই সাদা দাড়ী। হাতে একটি এক তারা।

পথিক ঘর্মক্লান্ত। তবু দুই চোখ পথের উপর নয়, পথের দুধারে। গ্রীষ্মের দাবদাহ সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। এই রুক্ষতার সৌন্দর্য বৈরাগীর মনের রঙের মত। পথিক তাই চেয়ে চেয়ে দেখছেন আর হাঁটছেন। মাঝে মাঝে এক তারায় হঠাৎ আঙুল অজানিতে গিয়ে পড়ে। টুংটাং আওয়াজ রৌদ্রের বিবাগী সুরে মিশে যায়। তা নিতান্ত অজানিতে। নচেৎ পথিকের মন এখন একতারার সুরে নয়, বহির্বিশ্বের ফ্রেমে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে ছায়াবতী গাছ পড়ে। কিন্তু মুসাফির থামে না। তিন মাইল দূরে গঞ্জ দেখা যায়। সেখানেই হয়ত তার গন্তব্য।

পেছনে আর একজন হাঁটছেন। একটু দ্রুত। তার ইচ্ছা অগ্রগামী পথিকের সঙ্গ ধরা। ডাক দিয়ে হয়ত চলা থামানো যায়। কিন্তু এই মুসাফির অতদূর গায়ে-পড়া-ভাব দেখাতে রাজি নন। তাছাড়া এই মহাজনের চেহারায় রুক্ষ-কাঠিন্যের ছাপ স্পষ্ট, তার কালো গুম্ফরাশি এবং সুঠাম লোমপূর্ণ দুই বাহুর মধ্যে। মুখটি বেশ চওড়া। চোখ গোলা-ভাঁটার মত। দেখলেই মনে হয়, এই মানুষ হুকুম দিতে অভ্যস্ত, তামিলে নয়। কিন্তু তিনি হাঁটছেন জোর-পা। অগ্রগামী পথিককে ধরা উচিত। পথ-চলার ক্লান্তি দূর করতে সঙ্গীর মত আর কিছু নেই। দ্বিতীয় পথিক জোরে হাঁটতে লাগলেন। ফলে ঘাম ঝরে তার শরীর থেকে। মুখে অস্বোয়াস্তির ছাপ পড়ে। কিন্তু তবু সংকল্প টলে না।

কাছাকাছি এসে দ্বিতীয় পথিক ডাক দিলেন, "ও ভাই।"

আগের পথিক এবার পেছনে তাকায়। অন্য মানুষ দেখে, মুখে অভিনন্দনের হাসি, থামলেন প্রথম পথিক।

পেছনে ফিরে বললেন, "আমাকে ডাকাছেন, ভাই?"

—— জী, পামালেকুম।

—— আলায়কুম আস্ সালাম।

—— আপনি কোন্ দিকে যাচ্ছেন?

—— ঐ গঞ্জে।

—— বেশ বেশ। আমিও যাব। বেশ ভালই হোল।

—— চলুন, একসঙ্গে কথায় বার্তায় যাওয়া যাবে।

দুইজনে এগোতে থাকে। এবার কিন্তু দুজনেরই পদক্ষেপ শথ। সঙ্গী পেলে পথের দূরত্ব আর ভীতিজনক থাকে না। তাই হয়ত তারা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। দুজনে পাশাপাশি। দাড়ি শোভিত পথিকের দৃষ্টি বাইরের দিকে। গুম্ফধারী মুসাফির কিন্তু সঙ্গীর দিকে বার বার তাকায়। গ্রীষ্মের দিগন্ত আলোর তীব্রতায় মুহ্যমান। সেই রূপ সব সময় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় মুসাফির সেদিকে তাকিয়ে সঙ্গীর চোখের দৃষ্টি কোথায় মিশেছে দেখতে চায়। সেই দৃষ্টি দিগন্ত অভিমুখী। দ্বিতীয় মুসাফির তাই কয়েকবার দূরে তাকিয়ে আবার সঙ্গীর অবয়বের দিকে লক্ষ্য করেন। অপরজন নির্বিকার।

এই নিঃস্তব্ধতা দ্বিতীয় পথিকের কাছে অসহ্য লাগে। কথার বন্ধন না এলে আর সঙ্গী কী?

গুমোট দূর করতে তিনি বেশ উঁচু আওয়াজেই বলেন, "ভাই, আপনি কি গান করেন?"

সদ্য চমক-ভাঙা প্রথম আন্‌মনা মুসাফির শুধান, "কি ভাই, আমাকে কিছু বলছিলেন?"

—— জী।

—— কি বলুন?

—— আপনি কি গান করেন?

—— জী, করি।

—— তবে একটা গান করুন না, যদি আপনার অসুবিধা না হয়।

—— না, অসুবিধা আর কি। তাহলে শুনুন।

গেরুয়া-বসন পথিক এক-তারার সাজ ঠিক করে নিলেন। তারপর গান ধরলেন:

দীল্ দরিয়ার মাঝে দেখ্‌লাম,
আজব কারখানা।।
দেহের মাঝে বাড়ী আছে,
সেই বাড়ীতে চোর লেগেছে,
ছয়জনাতে সিঁদ কাটিছে,
চুরি করে এক জনা।।
দেহের মাঝে বাগান আছে

নানা জাতির ফুল ফুটেছে
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে
কেবল লালনের প্রাণ মাত্‌লনা।

নির্জন মাঠ সুরের ঝর্ণাধারা থেকে পানীয় ঠোঁটে নিয়ে, তৃষ্ণা মেটায়। দাবদাহ দূরে সরে যায়। সুরের মোড়কে পৃথিবী যেন শরণার্থী।

কখন গান থেমে যায়, কেউ লক্ষ্য করে না। কারণ, পথের সঙ্গে পায়ের হদিস ঠিক ছিল।

দ্বিতীয় পথিক এই রেশে আঘাত দিলেন।

—— আহ্, চমৎকার গান গানতো আপনি?

—— জী।

—— চমৎকার আপনার গান।

—— জী, এ আর কী।

না, না। সত্যি সুন্দর গলা আপনার। আমি এ গান আর কখনও শুনিনি।

—— কখনও শোনেন নি?

—— না।

—— বেশ।

দুইজনের মধ্যে আর কোন বাক্যালাপ হয় না। তাড়াতাড়ি পথ শেষ করাই তখন লক্ষ্য।

মাঠ শেষ হোয়ে গেল। ওরা দুইজনে এখন লোকালয়ের মধ্যে এসে পড়েছেন। গাছ-গাছালির মাঝখানে খড়ো বাড়ী, টিনের ঘর, কচ্ছিৎ ইমারৎ দেখা যাচ্ছে। সড়কের দুপাশে এখানে বহু গাছের সারি। দুএকজন পথিক যে যার কাজে যাচ্ছে, এদের দিকে কেউ তাকায় না। তবু মানুষের সঙ্গ পাওয়া গেল, প্রথম মুসাফির ভাবলেন।

ওরা এবার একটা জায়গায় এসে পড়েছেন —— এখানে সড়কের দুপাশ ফাঁকা। তারপরই অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ভিটা, পুকুর পুষ্করিণী। এক জায়গায় জড়াজড়ি-করা কয়েকটা ইমারৎ দেখা গেল, বেশ বড় বাগানের ফলের গাছের সারির ভিতর দিয়ে।

দ্বিতীয় পথিকের সেদিকে চোখ পড়া মাত্র তিনি বৈরাগী পথিকের হাত ধরে টান দিলেন আর বললেন, "একটু জলদি আসুন। ঐ আমার ঘর দেখা যাচ্ছে। ঐ আমার বাগান। এই চারিদিকে যত জমি-জিরাৎ সব আমার। চলুন, চলুন। আপনাকে ঐ যে নারিকেল গাছ দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে যা ডাব খাওয়াব —— সাতদিনের পিয়াস মরে যাবে।"

প্রথম মুসাফির আর জবাব দেওয়ার অবসর পান না। দ্বিতীয় পথিকের মুঠির মধ্যে তার হাত বাঁধা। দ্রুত হাঁটতে তাই বাধ্য হচ্ছেন।

দুই জনে এসে একটা পাকা সান-বাঁধানো দীঘির ধারে থামলেন। পাড়ে শত শত নারিকেল গাছ।

দ্বিতীয় পথিক বললেন, "এখানে বসুন এই কামিনী গাছের ছায়ার নীচে। আমি ডাবের বন্দোবস্ত করি। এই সব আমার। এই দীঘি, আগান-বাগান, ওই ইমারৎ আর ওপাশে মাঠে চোখ যদ্দ র যায়, সমস্ত আবাদ জমি আমার। আর এই যে—— ।"

পথিকের কথা সমাপ্ত হয় না। এরা লক্ষ্য করেননি, সান-বাঁধা ঘাটের একপাশে দুটো মোটা নারিকেল গাছের আড়ালে আর একজন বেশ মোটা তেজীয়ান, গোঁফবান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন। একদম দুজনের মুখোমুখি।

উভয়ের সারা বদনে দৃষ্টি বুলিয়ে সে দ্বিতীয় পথিককে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কি বল্‌ছিলেন?"

—— এই আগান-বাগান ইমারৎ সব আমার।

—— আপনার নাম?

—— সোবহান জোয়ার্দার।

ঐ ব্যক্তি এক চোট হো-হো শব্দে খুব হেসে নিলে, তারপর বেশ রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "জোয়ার্দার? বাপের নামটা ঠিক মনে আছে ত?"

—— নিশ্চয় আছে। গোলাম রহমান জোয়ার্দার।

লোকটা আবার হাসতে লাগল। কিন্তু এবার হাসি হঠাৎ থামিয়ে বেশ তিরিক্ষি মেজাজে বল্‌লে, "আপনার মাথা ঠিক আছে ত ? বিস্ময়ে মুসাফির পাল্টা প্রশ্ন করেন, "কেন?"

'মাথা ঠিক আছে বলে ত মনে হয় না। জোয়ার্দার বলে এই গায়ে কোন গাধা পর্যন্ত নেই। মানুষ ত দূরের কথা।"

"মিথ্যে কথা। এসব আমার। সব আমার। তুমি কে হে?"

"মুখ সাম্‌লে ভদ্রলোকের মত কথা বলো। আপনি থেকে তুমি। আমার নাম সোলেমান মলিক। আমি এই সব জমি-জিরাৎ ইমারৎ-কোঠা — যা' কিছু দেখছ, সব আমার।"

"এ সব আমার।"

"চুপ চোর-জোচ্চার কোথাকার?"

"কি? আমার জিনিষ আর আমি চোর-জোচ্চোর।"

"যা ব্যাটা। এখনও তোর গায়ে হাত তুলিনি, তোর বাপের নসীব। যা মানে-মানে পালা। নাহলে জুতো খাবি, আবার পুলিশের হাতকড়া পর্যন্ত হাতে উঠবে।"

"তুমি ঝুট্ কথা বল্‌ছো," দ্বিতীয় মুসাফিরের মুখ থেকে এই প্রশ্ন বেরুনো মাত্র ঐ লোকটা এক থাপ্পড় তুলে এগিয়ে এলো। বারেক প্রথম মুসাফির মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সৌম্য মুখের দিকেই চেয়ে হয়ত সোব্‌হান মলিক হাত নামিয়ে নিলে।

দ্বিতীয় পথিক অর্থাৎ জোয়ার্দার চীৎকার দিয়ে ওঠে, "না, এই জমি-জায়গা আমার।"

মলিক আবার থাপ্পড় তুলে শাসায়। মাঝখানে প্রথম মুসাফির। সেই ত বাধা।

এই গোলমাল শুনে কয়েকজন লাঠি নিয়ে ছুটে এলো। একজন বল্‌লে, "বড়মিয়া সাহেব, আপনার গলা শুনে ছুটে এলাম। কি ব্যাপার?"

আঙ্গুল বাড়িয়ে মলিক জবাব দিল, "ঐ ফকীরের পেছনে ওই যে শালা দাঁড়িয়ে আছে জোয়ার্দার না, ফোয়ার্দার — শালাদের নাম কেউ এলাকায় কোনদিন শোনেনি, ব্যাটা বলে — এসব জমি-জায়গা বাগান দীঘি ওর। ব্যাটার আস্পর্ধা দ্যাখো।"

"একবার হুকুম দিন্ না। শালার মাথাটা একদম বাইনমাছ ছেঁচা করে দেই।" সমস্বরের মধ্যে অন্যান্য আদেশ-প্রার্থনার বুলি তলিয়ে গেল।

জোয়ার্দার তখন অবস্থার আঁচ পেয়ে আর মুখ খোলেন না। মুখ খুল্‌লেন ফকীর নামে সম্বোধিত প্রথম মুসাফির। তিনি বল্‌লেন, "ভাই, ইনি আমার সঙ্গী। আপনাদের জমি-জিরাতের মাম্‌লা, সেটা আদালতে ইন্‌সাফ হতে পারে। ও নিয়ে বিবাদ ভাল নয়। ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তার আগে আপনাদের একটা গান শুনিয়ে দিই।"

মলিক শান্ত হয়ে এসেছে এই প্রস্তাবে। বললে, "জনাব, ফকীর সাহেব, একটা ডাব খেয়ে নিন। আপনি ক্লান্ত। বেশ বোঝা যাচ্ছে। পরে গান করুন।"

"না ভাই, আমি ক্লান্ত নই। আমার অত ভুক — পিয়াস ঘন ঘন লাগে না।"
— তবে বসুন।
— না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইতে আনন্দ পাই।
গান শুরু হলো:
"মানুষ রে দেখরে ভাই দিব্যজ্ঞানে।
পাবি রে অমূল্য নিধি, এই বর্তমানে।।
ম'লে পাবো বেহেস্তখানা,
তা শুনে আর মন মানে না।
লালন কয়, বাকীর লোভে নগদ পাওনা
কে ছেড়েছে এই ভুবনে।।

পড়ন্ত দুপুর। রৌদ্রের রিমঝিম উত্তাপ সুরের মোচড়ে মূর্ছনার সঙ্গ-অভিলাষী। বায়ু-তরঙ্গ সকলের বক্ষ-সৈকতে সুরাবেশে বারবার আছড়ে পড়ে।

অনেক লোক জমেছে ইত্যবসরে। সুরের ইন্দ্রজালে কাজ ফেলে এসেছে কতজন। ছোট-খাট জমায়েৎ পাড়ের উপর স্তম্ভিত শ্রোতাদল।

সোলেমান মলিক গান থামার পর জিজ্ঞেস করে, "জনাব, আমার বেয়াদবী মাফ করবেন — আপনার নাম?"

— আমার নাম লালন ফকীর।

— কুষ্টিয়ার লালন ফকীর?

— হ্যাঁ, ভাই।

গ্রামের জমায়েৎ লোকদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। একজন চীৎকার দিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল, "ওরে কে কোথায় আছিস। লালন ফকীর ফিরে এসেছেন, ওরে আয়। গান শুন্‌বি। আয় চোখ সার্থক করবি — আয় — আয় — ।"

বিলম্ব হয় না। দলে দলে লোক জুটতে লাগল। ফকীর বিস্মিত।

একজন এগিয়ে এসে বললে, "জনাব, দাদা-পরদাদার কাছে আপনার নাম শুনেছি, গান শুনেছি। আপনাকে ছেড়ে দেব না। এখানে জায়গা কম। চলুন, দশ মিনিটের পথ গঞ্জ। গঞ্জের চবুতরায় হাজার হাজার লোক ধরে — সেখানে আপনাকে যেতে হবে।"

— চলুন।

ফকীর এইটুকু উচ্চারণ করেন মাত্র। তারপরই কয়েকজন তাঁকে কাঁধে তুলে নিল। ফকীরকে পায়ে হাঁটতে দেবে না। তাঁর হাজার অনুরোধ আর কেউ কানে নেয় না। ছোট ছোট জনস্রোত নানাদিক থেকে ছুটে আসছে।

লালন ফকীর বললেন, "আমার সঙ্গী যেন হারিয়ে না যায়।"

এতক্ষণে জোয়ার্দারের দিকে সকলের চোখ পড়ে। তিনি ফকীরের পাশেই আছেন।

হাজার হাজার জনতা গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে এসে জুটছে। সকলের মুখে মুখে সেই অপূর্ব কাহিনীর গুঞ্জন, "কবি লালন ফকীর আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।" লোকারণ্য বিস্তৃত হতে থাকে গঞ্জের চত্বরে, চতুর্দিকে।

মাঝখানে গানের আসর। গেরুয়া-বসন কবির কণ্ঠ ও একতারা নিনাদিত। অভিনয় সহকারে বাউল ফকীর মেতে উঠেছেন। স্তব্ধ জনতা। নির্বাক পৃথিবী। সুর আর সুরার পার্থক্য কতটুকু?

।। ২ ।।

জোয়ার্দার ।। কবি!

লালন।। কি, ভাই?

জোয়ার্দার।। আমি ভেবেছিলাম, আজ রাত্রি কেন, বহু রাত্রি তোমাকে বন্দী থাকতে হবে এখানে।

লালন ।। তা তো থাকার যো নেই। আমি বলে এসেছি, ইহলোকে একদিন থাকব। আজ ভোরেই নিজের ঠিকানায় পৌঁছব। বাইরে আসার নাম করে, চলে এলাম। ওই শুকতারা উঠছে! চলো, বাতাসে মিলিয়ে যাই।

জোয়ার্দার।। আমিও ত একদিনের ছুটি নিয়ে পৃথিবী দেখতে এসেছিলাম।

লালন। কি দেখলে?

জোয়ার্দার।। আমাকে কেউ চেনে না, নাম পর্যন্ত জানে না।

লালন। আর কি দেখলে?

জোয়ার্দার। আর কিছু না।

লালন।। যুগে যুগে তোমাদের এই আর এক দোষ।

জোয়ার্দার। কি?

লালন।। দেখলে না কিছু?

জোয়ার্দার। কি দেখব?

লালন।। দেখলে না? দেখলে না, একদিন তোমার কত কি, কত কে ছিল, আমার কিছুই ছিল না। আজ আমার সব আছে — অথচ তোমার কিছুই নেই।

জোয়ার্দার।। ঝুট কথা, ফকীর। আর কিছু না থাক, আমার বোনের জামাই ঠিক আছে। শাসালে আবার গাল-ও দিলে। শুনলেন না?

লালন।। অর্থাৎ আমার সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তুমি সম্বন্ধী?

জোয়ার্দার।। হ্যাঁ।

◆ ◆

টীকা

লালন ফকীর— বিখ্যাত বাউল সাধক ও কবি লালন শাহ্। ১১৭৯ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক ঝিনাইদহ'র হরিশপুর গ্রামে, মতান্তরে কুষ্টিয়া-কুমারখালীর ভাঁড়রা গ্রামে লালন শাহ্‌র জন্ম হয়। তাঁর গানের তত্ত্বমূল্য, রসব্যঞ্জনা ও শিল্পমূল্য বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদমুক্ত সর্বজনীন আবেদনের কারণে সর্বধর্মের মানুষের কাছেই লালন শাহ্ মহৎ কবিরূপে পরিচিত। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই অমর কবির জীবনাবসান ঘটে।

বস্তুসংক্ষেপ

ইহলোকে একদিন অবস্থানের বাসনা নিয়ে পরলোক থেকে মাটির পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন মরমী কবি লালন ফকীর। গ্রীষ্মের শেষ-দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা বোর্ডের সড়ক পথে গৈরিক বস্ত্র পরিহিত ও সাদা শ্মশ্রুমন্ডিত মুসাফির বেশী লালন ফকীর একতারা হাতে হেঁটে চলছিলেন। একদিকে রুক্ষ প্রকৃতির সৌন্দর্য অন্যদিকে বাউল কবির একতারা-ধ্বনিত টুংটাং বিবাগী সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। মুসাফির লালনের গন্তব্য হয়ত তিন মাইল দূরবর্তী গঞ্জ; কেননা তিনি বিরামহীন পদক্ষেপে ঐদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

লালন ফকীরের পেছনে আর একজন মুসাফিরও দ্রুত হাটছিলেন। তার উদ্দেশ্য অগ্রগামী মুসাফিরের সঙ্গ ধরে পথ-চলার ক্লান্তি খানিকটা দূর করা। দ্বিতীয় মুসাফিরের অবয়বে মহাজনী চেহারার রুক্ষ কাঠিন্যের ছাপ। তাকে দেখলেই মনে হয় ইনি হুকুম দিতেই অভ্যস্ত, হুকুম তামিলে নয়। দ্রুত হেঁটে দ্বিতীয় মুসাফির লালনের কাছাকাছি চলে আসেন এবং তার সঙ্গে কথা বলতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। লালন তার ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকান এবং সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ করেন। দ্বিতীয় মুসাফিরের প্রশ্নোত্তরে লালন জানান যে তিনিও গঞ্জের দিকে যাচ্ছেন। কথা বলার প্রলোভনে দ্বিতীয় মুসাফির সঙ্গী হন লালনের পথ চলার। কিন্তু কথা বলার চেয়ে লালনের কাছে নীরবতাই আনন্দের। তাঁর নির্বিকার বাউল-দৃষ্টি দিগন্ত অভিমুখী। এই স্তব্ধতা ভালো লাগে না দ্বিতীয় মুসাফিরের। স্তব্ধতার গুমোট দূর করার জন্যই লালনকে তিনি গান করেন কিনা জিজ্ঞেস করেন। লালন হ্যাঁ-সূচক উত্তর করলে একটি গান পরিবেশনের অনুরোধ করেন দ্বিতীয় মুসাফির। লালন উদাত্ত কণ্ঠে দেহতত্ত্ব বিষয়ক একটি মরমী গান গেয়ে শোনান। তার সুরের ঝর্ণাধারায় নিবারিত হয় তৃষ্ণা, দূরীভূত হয় দাবদাহ। বিমুগ্ধ দ্বিতীয় মুসাফির প্রশংসা করেন প্রথম মুসাফিরের গানের।

মাঠের পথ শেষ করে দুজনে লোকালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। চোখে পড়ে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ভিটা, পুকুর, জড়াজড়ি করা কয়েকটা ইমারৎ। আবেগাপুত দ্বিতীয় মুসাফির লালনের হাত ধরে টান দেন, অনুরোধ করেন দ্রুত হাঁটার। তিনি লালনকে দেখিয়ে দেন অদূরবর্তী ঘর, ফলের বাগান, জমি-জিরাৎ। আনন্দে আত্মহারা দ্বিতীয় মুসাফির চিৎকার করে বলতে থাকেন-'এই চারদিকের জমি-জিরাৎ সব আমার।' অতঃপর একটি পাকা সান-বাঁধানো দীঘির ধারে এসে দুজনে থামেন। আবেগাপুত দ্বিতীয় মুসাফির সারিবদ্ধ শত শত নারকেল গাছের পাশে কামিনী গাছের ছায়ায় বসার জন্য আহ্বান করেন লালনকে। জমিজমা ইমারৎ বাগান প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করে পুনরুক্তি করে বলেন, 'এই সব আমার।' কিন্তু তার সংলাপ সম্পূর্ণ না হতেই নারকেল গাছের আড়ালে বসে থাকা 'মোটা তেজীয়ান, গোঁফবান' এক ব্যক্তি উঠে আসেন তাদের সামনে। দ্বিতীয় মুসাফিরকে লক্ষ্য করে বলেন-'আপনি কি বলছিলেন?' দ্বিতীয় মুসাফির আশপাশের সবকিছু দেখিয়ে উত্তর দেন-'এই আগান-বাগান ইমারৎ সব আমার।' মোটা তেজীয়ান ব্যক্তিটি নাম জিজ্ঞেস করলে দ্বিতীয় মুসাফির জানান যে তার নাম সোবহান জোয়ার্দার। ব্যক্তিটির বিদ্রূপ- মেশানো দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সোবহান জোয়ার্দার তার বাপের নামটিও উচ্চারণ করেন। মোটাসোটা গোঁফবান ব্যক্তিটির সন্দেহ থাকে না যে জোয়ার্দার নিতান্তই এক উন্মাদ। তিনি জানিয়ে দেন যে, এ গ্রামে জোয়ার্দার নামে কোনো গাধার অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। কিন্তু ইহলোকে ফিরে আসা জোয়ার্দার তার নিজস্ব সম্পত্তির স্বত্ব বিস্মৃত হন কীভাবে? সম্বোধনে আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসেন জোয়ার্দার। দুজনের মধ্যে মারামারির উপক্রম হলে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েন সৌম্য দর্শন মুসাফির লালন ফকীর। গোলমাল শুনে আশপাশ থেকে লাঠি হাতে ছুটে আসে লোকজন। এরা এই জমিজিরাৎ-এর বর্তমান স্বত্বাধিকারি সোলেমান মলিকের আদেশের অপেক্ষা করে। বিপদজনক পরিণাম আঁচ করে জোয়ার্দার এবার মুখ বন্ধ রাখেন। ঐ মুহূর্তেই মুখ খোলেন প্রথম মুসাফির। তিনি বলেন — জমি-জিরাতের মামলার মীমাংসাস্থল আদালত। এ নিয়ে বিবাদ করা সমীচীন নয়। অতঃপর উত্তেজিত জনতার উদ্দেশে একটি গান পরিবেশনের প্রস্তাব করেন ফকীর মুসাফির। উত্তেজিত সোলেমান মলিক

এতে শান্ত হন। একতারা হাতে দাঁড়িয়ে গান শুরু করেন লালন শাহ্। প্রকৃতিলোকে ছড়িয়ে পড়ে লালনের কণ্ঠোচ্চারিত সুরের মূর্ছনা। সুরের সম্মোহনে ক্রমশ বেড়ে ওঠে জমায়েৎ। গান থামার পর সোলেমান মলিক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গায়ক ফকীরের নাম জানতে চান। গায়ক মুসাফির জানিয়ে দেন তাঁর নাম লালন ফকীর। সোলেমান মলিক প্রশ্ন করে নিশ্চিত হন — এই মুসাফিরই কুষ্টিয়ার বাউল সাধক লালন ফকীর। ফলে জমায়েতের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, এ ওকে ডাকতে শুরু করে। লালন ফকীরকে দেখে চোখ সার্থক করতে দলে দলে ছুটে আসে গ্রাম্য জনতা। যে কবির নাম এরা দাদা-পরদাদার কাছে শুনেছে, সেই কবিকে এরা সহজে ছাড়তে চায় না। সসম্মানে কাঁধে তুলে নিয়ে তারা গঞ্জের অভিমুখী হয়। গঞ্জের 'চবুতরায়' হাজার হাজার লোকের সামনে গান করতে হবে কবিকে। লালন এই হট্টগোলের মধ্যেও খোঁজ নেন সঙ্গী মুসাফিরের। দেখা যায় লালনের পাশেই আছেন সোবহান জোয়ার্দার।

গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আগত হাজার হাজার জনতা জড়ো হয় গঞ্জে, সকলের মুখে গুঞ্জন 'কবি লালন ফকীর আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।' লোকারণ্য ক্রমশ গঞ্জের চারদিকে বিস্তৃত হতে থাকে। একতারা হাতে গৈরিক-বসনধারী লালনের সুরেলা কণ্ঠ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। সুরের মায়াজালে জনতা স্তব্ধ হয়, নির্বাক হয় পৃথিবী।

গানের আসরের শেষে রাতের অন্ধকারে ইহলোকে আগত দুই মুসাফিরের পরলোকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে আসে। দুই মুসাফির পরস্পর আলাপচারিতায় নিবিষ্ট হন। জোয়ার্দারের ধারণা হয়েছিলো মর্তের বাসিন্দারা হয়তো অনেক রাত্রি বন্দী করে রাখবে এই শিল্পস্রষ্টাকে। জোয়ার্দার এই মনোভাব ব্যক্ত করলে লালন যে মাত্র একদিনের জন্যে মর্তলোকে এসেছিলেন সে কথা জানিয়ে দেন। আকাশে তখন উদীয়মান শুকতারা দৃশ্যমান। লালন রাত্রিশেষের পূর্বেই পরলোকে ফিরে যেতে চান। জোয়ার্দারও একদিনের জন্যই দেখতে এসেছিলেন মাটির পৃথিবী। লালন জানতে চান, মর্তলোকে এসে কী অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন জোয়ার্দার। জোয়ার্দার অকপটে জানিয়ে দেন যে, মর্তের মানুষ কেউ তাকে চেনে না, নাম পর্যন্ত জানে না — এই নির্মম বাস্তবতা তিনি প্রত্যক্ষ করে গেলেন পৃথিবীতে। কিন্তু জোয়ার্দারের এই দেখা যে একপেশে লালন সে কথাটি বুঝিয়ে দেন জোয়ার্দারকে। ইহলোকে জোয়ার্দার-এর অনেক ছিল, পক্ষান্তরে লালন ছিলেন কপর্দকশূন্য। আজ লালনের সব আছে, অথচ জোয়ার্দারের কিছুই নেই। মৃত্যুতে জোয়ার্দার নিঃস্ব; শারীরিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও, লালন যুগ-পরম্পরায় লোকমানসে অমর, জীবন্ত।

◆ ◆

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. ইহজগতে আগত লালন ফকীর যখন সড়ক-পথে হাঁটছিলেন তখন প্রাকৃতিক পরিবেশ কেমন ছিল?

২. গঞ্জের পথ ধরে চলমান দুই মুসাফিরের আলাপের বিষয় বর্ণনা করুন।

৩. নিজের বাড়ি-ঘর জমি-জিরাৎ দেখে দ্বিতীয় মুসাফির সোবহান জোয়ার্দার-এর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

৪. লালনের সুরের মূর্ছনা প্রকৃতিলোকে ও জনমানসে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল?

৫. লালনের পরিচয় জানতে পেরে গ্রাম্যজনতা কী আচরণ করেছিল?

৬. জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে সোবহান জোয়ার্দার-এর দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করুন।

৩ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

মাটির পৃথিবীতে আগত দ্বিতীয় মুসাফির সোবহান জোয়ার্দার-এর সমগ্র অবয়বে মহাজনের চেহারার রুক্ষ কাঠিন্যের ছাপ স্পষ্ট করে তুলেছে তার যাপিত ইহজৈবনিক বিষয়াসক্ত জীবনের ইতিহাস। এই মানুষটিকে দেখলেই বোঝা যায় ইনি হুকুম দিতে অভ্যস্ত হলেও হুকুম পালনে তৎপর নন। বস্তুত মর্তলোকে তার আগমনের হেতুও তার অপরিমেয় বিষয়াসক্তি। মহাজনী কৌশলে ইহজীবনে তিনি যে বিষয়-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ করার পিছুটান থেকেই ইনি একদিনের জন্য ফিরে এসেছেন ইহজগতে। পথচলার ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্য থেকেই তিনি দ্রুত হেঁটে এসে অগ্রগামী মুসাফির লালন ফকীর-এর সঙ্গী হন। বাউল লালনের দৃষ্টি দিগন্ত অভিমুখী, কিন্তু বিষয়াসক্ত সোবহান জোয়ার্দারের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে পথের দুপাশের জমি-জিরাৎ, বাগান আর ইমারতের দিকে। পথ চলতে চলতেই সোবহান জোয়ার্দার হঠাৎ আবেগে উদ্দীপনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। পথসঙ্গী লালনের হাত আকর্ষণ করে তিনি অদূরবর্তী আগ্‌ান-বাগান ইমারৎ আর জমি-জিরাৎ-এর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বলে ওঠেন, -'এই সব আমার।' বহুপূর্বে ইহজীবন ত্যাগ করলেও বিষয়ান্ধ সোবহান জোয়ার্দার মমতা কাটাতে পারেননি মহাজনী কায়দায় মর্তলোকে গড়ে তোলা তার বিশাল বিষয়-সাম্রাজ্যের আকর্ষণ। ঐ আকর্ষণ থেকেই নিজের গড়া বিষয়-সাম্রাজ্য দেখার আনন্দ উপভোগ করার জন্যই তিনি অমর্ত থেকে নরলোকে ফিরে এসে বিষয়ানন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।

৪ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

কুষ্টিয়া জেলা বোর্ডের সড়ক-পথে লালন যখন একমনে হেঁটে চলেছিলেন, তখন মাঝে মাঝে অজানিতেই তার আঙুল এক তারায় সুর তুলছিল। এই সুর প্রকৃতির রুক্ষ সৌন্দর্য আর রৌদ্রের বিবাগী সুরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিলো। এই চলার পথেই দ্বিতীয় মুসাফির সোবহান জোয়ার্দার-এর অনুরোধে সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে গান গেয়ে শোনান লালন ফকীর। রুক্ষ নির্জন মাঠ লালনের সৃজন করা এই সুরের ঝর্ণাধারা থেকে পানীয় সংগ্রহ করে তৃষ্ণা মেটায়। সোবহান জোয়ার্দারও মুগ্ধ হন লালনের গানে। এমন মরমী বাউল গান তিনি শোনেন নি কখনো।

গল্পটিতে একতারা হাতে লালন দ্বিতীয়বার গান পরিবেশন করেন এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে, উত্তেজনা প্রশমনের স্বার্থে। বিষয়াসক্ত পরলোকবাসী জোয়ার্দার তার ইহজাগতিক সম্পত্তির স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে উঠলে সোলেমান মলিকের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। উত্তেজনা ও চেঁচামেচির কারণে সোলেমান মলিকের স্বপক্ষে মারমুখী জনতার সমাবেশ ঘটলে জোয়ার্দার আর মারমুখী মলিকের মধ্যে এসে দাঁড়ান সৌম্যদর্শন লালন ফকীর। 'জমি-জিরাতের মাম্‌লা আদালতে ইন্‌সাফ হতে পারে' — বলে লালন একটি গান পরিবেশনের প্রস্তাব রাখেন উত্তেজিত জনতার কাছে। অতঃপর একতারা হাতে দাঁড়ানো লালন ফকীর গেয়ে শোনান এক মরমী গান। গ্রীষ্মের পড়ন্ত দুপুরে 'রৌদ্রের রিমঝিম উত্তাপ' লালনের সম্মোহনী সুর-মূর্ছনার সঙ্গ-অভিলাষী হয়। সম্মোহিত জনতার 'বক্ষ- সৈকতে' লালনের সুরে আবেশ বায়ু-তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ে। সুরের মায়াজালে মোহাবিষ্ট শ্রোতৃএন্ডলী বিমূঢ় হয়ে পড়ে যখন তারা জানতে পারে এই সুকণ্ঠ গায়ক সুবিখ্যাত লালন শাহ্। এদের কেউ দাদা-পরদাদার কাছে শুনেছে লালন ফকীরের নাম। কাজেই এরা সহজে লালনকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। সসম্মানে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গঞ্জ অভিমুখী হয় রসাগ্রহী জনতা। গঞ্জের 'চবুতরায়' হাজার হাজার লোকের সমাবেশে গান পরিবেশন করতে হবে লালনকে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসে জনস্রোত; সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে 'অপূর্ব কাহিনীর গুঞ্জন'- 'কবি লালন ফকীর আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন'। লোকারণ্য ক্রমশ বিস্তৃততর হয় গঞ্জের চারদিকে। গৈরিকবসন বাউল-কবির বাণীকণ্ঠ আর একতারার সুরলহরী অভিনয় সহযোগে পরিবেশিত হয়ে চলে। লালনের সুরবাণীর ইন্দ্রজালে জনতা স্তব্ধ হয়। আর নির্বাক হয় মাটির পৃথিবী।

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. এই রুক্ষতার সৌন্দর্য বৈরাগীর মনের রঙের মত।
২. দেখলেই মনে হয়, এই মানুষ হুকুম দিতে অভ্যস্ত, তামিলে নয়।
৩. এই সব আমার। এই দীঘি, আগ্‌ান-বাগান, ওই ইমারৎ আর ওই ইমারৎ আর ওপাশে মাঠে চোখ যদ্দ র যায়, সমস্ত আবাদ জমি আমার।
৪. আপনাদের জমি-জিরাতের মাম্‌লা, সেটা আদালতে ইন্‌সাফ হতে পারে। ও নিয়ে বিবাদ ভাল নয়।
৫. আমাকে কেউ চেনে না, নাম পর্যন্ত জানে না।

৬. একদিন তোমার কত কি, কত কে ছিল, আমার কিছুই ছিল না। আজ আমার সব আছে — অথচ তোমার কিছুই নেই।
৭. আমার সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তুমি সম্বন্ধী?

১ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ

আলোচ্য বাক্যটি শওকত ওসমান লিখিত 'প্রস্তর ফলক' গল্পগ্রন্থের 'দুই মুসাফির' গল্পের অন্তর্গত।
উদ্ধৃত অংশে গ্রীষ্ম প্রকৃতির রুক্ষতার সৌন্দর্য রূপায়ণে গত্মকার অনন্যসাধারণ এক উপমা সৃজন করেছেন।
একদিনের জন্য অমর্ত থেকে নরলোকে ফিরে এসেছেন মুসাফির-বেশী কবি লালন ফকীর। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা বোর্ডের সড়ক পথে গঞ্জ-অভিমুখী লালন হেঁটে চলছিলেন। রৌদ্রের খরতাপে কর্মক্লান্ত পথিক-লালন পথের দুদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে এগিয়ে যান। রুক্ষ প্রকৃতির সৌন্দর্য আকৃষ্ট করে লালনকে। গত্মকার তাঁর সর্বদর্শীভাষ্যে এই রুক্ষ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপমিত করেন বাউল বৈরাগীর মনের রঙের তুলনায়। গ্রীষ্মের রুক্ষ প্রকৃতির সৌন্দর্য নিহিত তার নির্বিকারত্ব ও নিরাসক্তিতে। অন্যদিকে বিবাগী-বাউলের মনও সংগঠিত হয় নির্মোহ ও আসক্তিশূন্য জীবনবোধের সমন্বয়ে। এ জন্যই সুদক্ষ গত্মকার বিবাগীয় মনের রঙের প্রতিসাম্যে উপমিত করেছেন নিরাসক্ত গ্রীষ্ম প্রকৃতির রুক্ষ সৌন্দর্যকে।

৪ নং ব্যাখ্যার নমুনা- উত্তরঃ

উদ্ধৃত সংলাপটি শওকত ওসমানের 'প্রস্তর ফলক' গল্পগ্রন্থের 'দুই মুসাফির' গল্প থেকে সংগৃহীত হয়েছে।
আলোচ্য সংলাপটি ফকীর লালন শাহের। ভূ-সম্পত্তি নিয়ে সোবহান জোয়ার্দার এবং সোলেমান মলিকের মধ্যকার মারমুখী বিবাদ নিরসনকল্পে প্রচন্ড উত্তেজনার মুহূর্তে উভয়পক্ষের উদ্দেশে লালন শাহ্ সংলাপটি উচ্চারণ করেছিলেন।
পথ চলতে চলতে প্রথম মুসাফির-বেশী লালনকে দ্বিতীয় মুসাফির-বেশী সোবহান জোয়ার্দার আশে-পাশের জমি-জিরাৎ আগ্‌ান-বাগান আর ইমারৎ দেখিয়ে সগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন যে, দৃশ্যমান ঐ সম্পদরাশির স্বত্ত্বাধিকারী তিনি নিজে। ঐ সংলাপটি পুনরুচ্চারণ কালে অকস্মাৎ ঘটনার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে ঐ সব ভূ-সম্পত্তির বর্তমান অধিকারী সোলেমান মলিকের। আবেগাতিশয্যে সোবহান জোয়ার্দার একথা বিস্মৃত হন যে, তিনি পরলোক থেকে ইহলোকে এসেছেন। যে ভূ-সম্পত্তি রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কালক্রমে তার স্বত্ব বদল হয়ে গেছে। ফলে ভূসম্পত্তির বর্তমান মালিক সোলেমান মলিকের সঙ্গে কলহে জড়িয়ে পড়েন জোয়ার্দার। চিৎকার চেঁচামেচির উত্তেজনাকর মুহূর্তে লাঠি-সমেত উত্তেজিত জনতা এসে শামিল হয় সোলেমান মলিকের পক্ষে। এই বিবাদ নিরসনের মানসেই মুসাফির বেশী লালন ফকীর উপর্যুক্ত সংলাপটি উচ্চারণ করে উত্তেজিত জনতার উদ্দেশ্যে একটি গান পরিবেশনের প্রস্তাব রাখেন। ঐ সংলাপটিতে ব্যবহৃত শব্দ রূপক তাৎপর্যবহ। এ মর্তলোক-বাসী জোয়ার্দার আর মাটির পৃথিবীর মলিক কখনোই ইন্‌সাফের প্রত্যাশায় আদালতের শরণাপন্ন হবেন না, হওয়া সম্ভব নয়। বাউলতত্ত্বে আত্মসমর্পিত লালন ফকীর মূলত বিশ্ববিধানের নিয়ন্তাকে উপলক্ষ করেই সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। লালন জানেন, যে ভূসম্পত্তি নিয়ে জোয়ার্দারের আবেগ উচ্ছ্বাস ও স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা, সে জমি-জিরাৎ এখন অন্যের অধিকৃত। আবার সেই জমিই আজ মলিকের অধিকৃত হলেও, কালভেদে এ জমির স্বত্ত্ব পরিবর্তিত হবে। মরণশীল মানুষ বিষয়শূন্য হয়েই পরলোকে উত্তীর্ণ হয়। তত্ত্বজ্ঞানী লালন ফকীর এও জানেন যে, নিঃস্ব হয়েও কিছু মানুষ আছেন যারা ইহলোক পরলোক তথা সর্বকালের মানবসম্পদ রূপে যুগে যুগে গ্রহণীয় হয়ে ওঠেন।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. লালন ফকীরের প্রতি সাদর অভ্যর্থনার বিপরীতে জোয়ার্দারের প্রতি গ্রাম্য জনতার উপেক্ষা ও উপহাসের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. দুই মুসাফির গল্পের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. 'দুই মুসাফির' গল্প অবলম্বনে লালন ফকীরের প্রতি গ্রাম্য জনতার ঔৎসুক্যের কারণ বিশেষণ করুন।
৪. পরলোক থেকে ইহলোকে আগত দুই মুসাফিরের আবির্ভাবকালীন পরিবেশ, প্রকৃতি এবং পরস্পরের সংলাপ ও যাত্রাপথের বর্ণনা দিন।

৫. 'দুই মুসাফির' গল্পের নামকরণের তাৎপর্য বিচার করুন।

২ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

'দুই মুসাফির' বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান রচিত একটি রূপক তাৎপর্যবহ ছোটগল্প। একদিনের জন্য পরলোক থেকে ইহলোকে নেমে আসা দুই মুসাফিরের প্রাক্তন পরিচিত জগৎ পরিদর্শনের সূত্রে গত্মকার দুই মুসাফিরের বিষয়াসক্ত ও বিষয়-আসক্তিশূন্য জীবনের পটভূমিকায় নির্মোহ বাউল কবির সৃষ্টির সর্বজনীনতা ও কালজয়ী মাহাত্ম্য অর্জনের দিকটিকে বাময় করে তুলেছেন। স্থাবর সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির স্বত্ব চিরস্থায়ী নয়, কাল পরম্পরায় সম্পদের স্বত্বাধিকারের পরিবর্তন ঘটে। মৃতুর সময় কপর্দকশূন্য হয়েই মরণশীল মানুষকে ইহজগৎ থেকে চলে যেতে হয়। কিন্তু সৃজনশীল মহৎ মানুষের সাধনায় এমন কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যা অস্থাবর হয়েও চিরায়ত। মৃত্যুর পরও এতে ব্যক্তির গৌরব অক্ষুণ্ন থাকে। কবি প্রতিভা আর কবির সৃজনকর্ম এমন ধরনেরই এক মানব সৃষ্ট সম্পদ, কালস্রোতে যা হারিয়ে যায় না ; বরঞ্চ উত্তরকালের মানব পরম্পরা নতুন মূল্যে তাকে অভিষিক্ত করে।

আলোচ্য 'দুই মুসাফির' গল্পে দেখা যায়, পরিচিত প্রাক্তন জগৎ পরিদর্শনের প্রত্যাশায় আগত দুই মুসাফিরের মধ্যে প্রথম জন বাউলের নির্মোহ দৃষ্টিপাতে এগিয়ে চললেও, দ্বিতীয় মুসাফিরের দৃষ্টিবিন্দুর মধ্যে সংলিপ্ত ছিল লোভ মোহ ও আসক্তি। পূর্ব জীবনের পরিচিত লোকালয়ে প্রবেশমাত্রই দ্বিতীয় মুসাফির সোবহান জোয়ার্দারের দৃষ্টি থেকে মোহের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। একস্থানে বেশ বড় এক ফল বাগানের গাছের সারির ভেতর দিয়ে জড়াজড়ি করা কয়েকটা ইমারৎ দেখা যাওয়া মাত্রই বিষয়াসক্ত সোবহান জোয়ার্দার আবেগাতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। ফলত প্রথম মুসাফির ফকীর লালন শাহের হাত আকর্ষণ করে তিনি বলে ওঠেন: 'একটু জলদি আসুন। ঐ আমার ঘর দেখা যাচ্ছে। ঐ আমার বাগান। এই চারিদিকে যত জমি-জিরাৎ সব আমার।' জোয়ার্দারের মুঠির মধ্যে লালনের হাত বাঁধা থাকায় তাকে বাধ্য হয়েই দ্রুত হাটতে হয়। কিছুক্ষণ পর শত শত নারকেল গাছ ঘেরা একটি সান-বাঁধানো দীঘির পাড়ে এসে দুজন থামেন। মোহাবিষ্ট জোয়ার্দারের আবেগ উচ্ছ্বাস তখন মাত্রাহীন পর্যায়ে চলে যায়। একটি কামিনী গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য প্রথম মুসাফিরকে বসার আহ্বান জানিয়ে জোয়ার্দার নতুন-শব্দ-সহযোগে পুনরক্তি করেন তার পূর্বের বক্তব্য। এবারে উচ্চারিত তার সংলাপ আরও তীর্যক; অন্তস্থল উদ্ভূত স্বত্বচেতনার স্পর্শ মাখানো — "এই সব আমার। এই দীঘি, আগ্‌ান-বাগান, ওই ইমারৎ আর ওপাশে মাঠে চোখ যদ্দার যায়, সমস্ত আবাদ জমি আমার।"

এই প্রতিতুলনার বিপরীতে গত্মকার শওকত ওসমান নিরাসক্ত জীবনের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে সংকেতিত করেছেন লালন চরিত্র উপস্থাপনায়। লালনের দৃষ্টি-ঐশ্বর্যের সারবত্তা শোষণ করে নিয়ে তিনি গল্পের সূচনাতেই গ্রীষ্মের নিরাসক্ত প্রকৃতির রুক্ষ সৌন্দর্যকে বৈরাগীর মনের রঙের উপমানে প্রতিভাসিত করেছিলেন।

ঘটনার রঙ্গমঞ্চে জোয়ার্দার কথিত আগ্‌ান-বাগান, জমি-জিরৎ আর ইমারৎ এর বর্তমান স্বত্বাধিকারী সোলেমান মলিকের আকস্মিক আবির্ভাব মাত্রই সৃষ্টি হয় জটিরতা, পরস্পরের কলহ এক সময় মারামারির স্তরে পৌঁছায়। চিৎকার চেঁচামেচিতে মলিকের অনুকূলে লাঠিসমেত মারমুখী জনতা এগিয়ে এলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। উত্তেজনার এই তুঙ্গ মুহূর্তে গৈরিক-বসন বাউল-লালন সুরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে প্রশমিত করেন উত্তেজনা। তিনি জমি-জিরাতের মামলার বিষয় একমাত্র আদালতেই ইন্‌সাফ হতে পারে মন্তব্য করে উত্তেজিত জনতার উদ্দেশে গান পরিবেশনের প্রস্তাব রাখেন। আদালতের ইন্‌সাফ প্রসঙ্গে লালন ফকীরের মন্তব্য দ্ব্যর্থকতা-বোধক। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্ব চিরস্থায়ী হয় না; কাল পরম্পরায় এ স্বত্বের পরিবর্তন ঘটে। প্রভূত সম্পত্তির মালিক হলেও, যে কোন মানুষকে কপর্দকশূন্য হয়েই ইহজীবন ত্যাগ করতে হয়। ফলে ধনী নির্ধনের অবস্থানের বিচার বিশ্ববিধাতার ওপরই বর্তায়। অন্যদিকে সৃজনশীল মানবসৃষ্ট শিল্প সাহিত্যের মত কিছু অস্থাবর সম্পদ রয়েছে, যা চিরায়ত মূল্যে অভিষিক্ত হয়ে অনাগত কালের মানুষের কাছেও বহুমূল্যে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। প্রথম মুসাফির লালন ফকীর সৃষ্ট সুর-বাণী এমনই এক চিরায়ত সম্পদ যা তার উত্তরকালের মানুষের কাছেও মহামূল্যে প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই গল্পে দেখা যায়, তার সুরবাণীর ইন্দ্রজালে উত্তেজিত জনতা স্তব্ধ হয়, নির্বাক হয় মাটির পৃথিবী।

পূর্ব-পরিচিত ইহজগৎ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই মর্তলোকে আগমন করেছিলেন দুই মুসাফির। একদিনের নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে পরলোকের উদ্দেশে যাত্রার প্রাক্কালে দুই মুসাফিরের বিনিময়কৃত সংলাপ-সূত্রে তাদের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার যে পরিচয় বিন্যাস করেছেন গত্মকার 'দুই মুসাফির' গল্পের মর্মবাণী ঐ সংলাপগুচ্ছের

অর্থদ্যোতনার মধ্যেই সুচিহ্নিত হয়ে আছে। বিষয়াসক্ত সোবহান জোয়ার্দার তার স্বরচিত ভুবনে প্রত্যাবর্তন করে দেখেছেন কেউ তাকে মনে রাখেনি। যার দৃষ্টিপাতে মহাজনী দ্যুতি সতত বিচ্ছুরিত হয়, তিনি আবেগে অনুরাগে যতই বলুন এ সম্পত্তি 'আমার', উত্তরকালের মানুষের কাছে তা গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু বিষয়-বিবাগী বাউল লালন ফকীর মর্তলোকে এসে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছেন যে, সোবহান জোয়ার্দারের একদিন প্রভূত সম্পত্তি ছিল, কিন্তু আজ তিনি কপর্দকশূন্য। অন্যদিকে ইহজীবনে লালনের কিছুই ছিল না, অথচ আজ তার সব আছে। লালন ফকীরের অভিজ্ঞতার এই সূত্রকেই গল্পকার গল্পের মর্মবাণী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি জনমনে এই সত্য সঞ্চারিত করে দিতে চান যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের সর্বোৎকৃষ্ট বিচারক সমকাল নয়, উত্তরকাল।

পাঠ-৫

অপঘাত

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
(১৯৪৩-১৯৯৭)

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি —

- গ্রাম-জীবনে বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কেরানি এবং চাষীর শ্রেণী অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- মোবারক আলীর ভাবনার অনুসরণে দেশের জন্য শাজাহানের মৃত্যু ও মরদেহ দাফন করাকে কেন্দ্র করে দেশের জন্য বুলুর আত্মবলিদানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গল্পটিতে ব্যবহৃত অপভাষা ও উপভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবেন।
- একজন শহীদ পিতার শঙ্কামুক্তির কারণ ও আত্মগৌরবের উৎস বিশেষণ করতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় চরিত্রের পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্র বিশেষণ করতে পারবেন।
- গল্পটির বিশিষ্টতার কারণসমূহ সূত্রাবদ্ধ করতে পারবেন।
- 'অপঘাত' গল্পের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

লেখক-পরিচিতি

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রংপুর ও বর্তমান গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে বিশিষ্ট কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস এবং মা মরিয়ম ইলিয়াসের চার পুত্রের মধ্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলিয়াসের জন্মকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) মহামন্বন্তরের সময়চিহ্নিত। এ সময়ে বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ইলিয়াসের পিতা বগুড়া জেলার অন্তর্গত সারিয়াকান্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের শৈশবের কয়েক বছর অতিবাহিত হয় পিত্রালয় বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে করতোয়া নদীর তীর ঘেঁষা নারুলি গ্রামে। পিতার দলীয়-রাজনীতি-সংশিষ্ট জীবনের কারণেই ইলিয়াসকে অল্প বয়সেই গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসতে হয়। তার পিতা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় সপরিবারে ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস লক্ষ্মীবাজারে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরের বছর দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে কেএল জুবিলি স্কুলে স্থানান্তরিত হন তিনি। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে সরাসরি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন ইলিয়াস। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আবার স্কুল পরিবর্তন করে বগুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি হন তিনি। ঐ স্কুল থেকেই ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ইলিয়াস। বগুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সময়েই সাহিত্যজগতে প্রবেশ ঘটে তাঁর। সত্যযুগ ও আজাদ পত্রিকার ছোটদের পাতায় তাঁর লেখা এ সময়ে প্রকাশিত হয়। তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা ছোটগল্প।

ম্যাট্রিক পাস করার পর ইলিয়াস পুনরায় ঢাকায় ফিরে এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন এবং ঐ কলেজ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আই.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ইলিয়াস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যথাক্রমে বি.এ অনার্স ও এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কর্মজীবন শুরু হয় করটিয়ার সাদত কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়ে। তবে এখানে যোগদানের কয়েকদিন পরই ইলিয়াস ঢাকার জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তাঁর অখন্ড শিক্ষকতা জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে ঐ কলেজে। তবে সরকারি কলেজে চাকরির সূত্রে অন্যান্য কলেজেও তাঁকে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে সময়ে সময়ে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রীর নাম সুরাইয়া ইলিয়াস।

বাংলা কথাসাহিত্যের অবিস্মরণীয় লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন তাঁর গল্পের উপন্যাসে। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও, রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বিশেষত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসমূহের প্রতি ছিলো তাঁর অপার আগ্রহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পূর্ববর্তী আন্দোলনসমূহ তাঁর রচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পুরনো ঢাকা, তাঁর জনজীবন ও ভাষা ইলিয়াসের গল্পের অন্যতম প্রধান উপকরণ। তাঁর রচনাভান্ডার বিশাল না হলেও বিষয় ও প্রকরণ উভয়দিক থেকেই অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

সাহিত্যকৃতীর স্বীকৃতি স্বরূপ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লাভ করেন বাংলাদেশ লেখক শিবির প্রদত্ত হুমায়ুন কবির স্মৃতিপুরস্কার (১৯৭৭), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), প্রফুল কুমার সরকার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৬), সাদত আলী আকন্দ পুরস্কার (১৯৯৬) এবং কাজী মাহবুবউলাহ স্বর্ণপদক (১৯৯৬)।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি ঢাকার কমিউনিটি হাসপাতালে মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবনাবসান ঘটে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর গ্রন্থাবলী

গল্পগ্রন্থ: অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধেভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯), জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল (১৯৯৭)।

উপন্যাস: চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬), খোয়াবনামা (১৯৯৬)।

প্রবন্ধ: সংস্কৃতি ভাষা সেতু (১৯৯৭)।

সম্পাদনা: বাংলাদেশের শিক্ষা: অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ (১৯৯০), বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাহিত্য পত্রিকা তৃণমূল (প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২)।

পাঠ- পরিচিতি

'অপঘাত' গল্পটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর দোজখের ওম গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চারটি গল্পের তৃতীয়গল্প 'অপঘাত'। দোজখের ওম ঢাকার প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ব্যক্তিক ও পারিবারিক স্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 'অপঘাত' গল্পের বিষয়বস্তু। তবে ব্যক্তিক ও পারিবারিক সংকট অতিক্রম করে গল্পটি মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে মূর্ত করে তুলেছে।

সর্বজ্ঞ লেখকের উপস্থাপনা কৌশলে গল্পটি বর্ণিত হলেও, প্রায় সমগ্র গল্প জুড়েই বিন্যস্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র মোবারক আলির দৃষ্টিকোণ, তার উপলব্ধি প্রতিক্রিয়া ও মূল্যায়ন। গত্মকারের বর্ণনার পরতে পরতে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বগুড়া জেলার একটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলির অন্তর্ময় ভাবনাপুঞ্জকে অসামান্য দক্ষতায় বিন্যস্ত করে দিয়েছেন গত্মকার। মোবারক আলির ভাবনার অনুষঙ্গ ধরেই গল্পের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে অন্যান্য চরিত্রের। মুক্তিযুদ্ধ ও গ্রামীণ বাস্তবতানিষ্ঠ উপমা ও চিত্রকল্প যোজনার পাশাপাশি গত্মকার একইসঙ্গে অপভাষা ও বগুড়ার আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারেরও দিয়েছেন সাফল্যের পরিচয়।

মোবারক আলির কলেজ পড়ুয়া ছেলে সুলতান ওরফে বুলু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নেই যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিবাহিনীর একজন সক্রিয় সংগঠক ও সদস্য হিসেবে গেরিলা যুদ্ধে জীবনাবসান ঘটে তার। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে বৌ-ডোবা খালের ব্রিজে মাইন পোঁতার মিশনে সহযোদ্ধাদের নিয়ে অংশ নেয় বুলু। মাইন পোঁতার প্রাক-মুহূর্তে এগিয়ে আসা মিলিটারি জীপের আওয়াজ পেয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বুলু গ্রেনেড নিক্ষেপ করে জীপে। এতে পাক সেনাদের অনেকেই নিহত হয়। কিন্তু গ্রেনেড নিক্ষেপের পূর্বে জীপ থেকে লাফিয়ে পড়া একজন পাক সেনার নিক্ষিপ্ত দুটি গুলিতে বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায় বুলুর। শহীদ পিতা মোবারক আলি জানে তার পুত্রের এই আত্মদান আকস্মিক দুর্ঘটনার পরিণতি নয়, নয় অপমৃত্যুও। তবু পরিবারের ও গ্রামবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থেই পুত্র বুলুর বীরত্বকাহিনী সাধারণ্যে গোপন রাখে সে। ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে বসেছে পাকমিলিটারিদের ক্যাম্প। মিলিটারি ক্যাপ্টেন-এর আকস্মিক জিজ্ঞাসার সম্ভাব্য উত্তর তাই মনে মনে সাজিয়ে রাখে মোবারক আলি। জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলবে তার ছেলে বুলুর মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে। বুলুর মায়ের একটানা কান্নার শব্দে আতঙ্ক-শিহরিত মোবারক আলি সব ঘটনা স্ত্রীর কাছে সবিস্তরে বর্ণনা করেও অপঘাতে মৃত্যুর বিষয়টি শহীদ জননীর ধারণাতেও প্রোথিত করে দেয়। তবে গল্পের শেষে মোবারক আলী গোপন রাখতে পারে না তার অন্তর্গত বিক্ষোভ ও গৌরব। পূর্বেই চেয়ারম্যানকে সে অবহিত করেছে ঘটনা, এবারে মসজিদের ইমাম-কাম-মোয়াজ্জিনের কাছেও সবিস্তারে বর্ণনা করে শহীদ পুত্রের আত্মদানের কাহিনী। চেয়ারম্যানের একমাত্র পুত্র

বুলুর বিদ্যালয়— জীবনের সহপাঠী শাজাহানের টাইফয়েড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া ক্রমে আত্মস্থ হতে সাহায্য করে মোবারক আলীকে। শাজাহান মৃত্যুর পূর্বে বিকারাবস্থায় সহপাঠী মুক্তিযোদ্ধা বুলুর নাম ধরে ডেকেছে বার বার, প্রকাশ করেছে বুলুর সঙ্গে চলে যাবার ব্যাকুলতা। এই তথ্য শোনামাত্র বুলুর আত্মবলিদান নবমাত্রা পেয়েছে পিতা মোবারকের কাছে। ফলে অনেক টানাপোড়েনের শেষে দ্বিধান্বিত মোবারক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, রোগভোগে সাধারণ মৃত্যুর সঙ্গে, দেশের জন্য পুত্রের আত্মবলিদানের তুলনা হয় না। শহীদ পিতার এই আত্মোপলব্ধিই 'অপঘাত' গল্পের ভাবৈশ্বর্যের শীর্ষচূড়ান্ত। গল্পের শেষে ভয়মুক্ত নির্ভয় মোবারক স্ত্রীর একটানা কান্নায় পূর্বেকার মতো শঙ্কাতাড়িত হয় না। বরঞ্চ সন্ধ্যার পরেও বাড়ি ফিরতে দেরী হওয়ার কারণে তার জন্য স্ত্রীর ব্যাকুলতা মোবারকের কাছে অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হয় বলেই সে এমন ভাবনা ভাবতে পারে যে, 'যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয়নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কিভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?'

আয়রনির ব্যবহার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অপঘাত' গল্পের নামকরণে সঞ্চারিত আয়রানির বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা গল্পটিকে গল্পটির ব্যতিক্রমী রসাবেদনের মূল ভিত্তি। আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা অপমৃত্যুর সমার্থক শব্দ অপঘাত দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী শহীদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ নয়। গত্মকারও বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। প্রথম পর্যায়ে বুলুর ভীতসন্ত্রস্ত পিতা পুত্রের অপঘাত মৃত্যুর কথা বলে আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তির পথসন্ধান করেছে। জোয়ান বাঙ্গালী ছেলের অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে পাক-মিলিটারির কাছেও গ্রহণযোগ্য সংবাদ হিসাবে গণ্য হবে— এ বিশ্বাসও সক্রিয় ছিল মোবারকের ভাবনায়। কিন্তু গল্পের শেষে, যুদ্ধের ময়দানে বুক উচিয়ে বুলুর আত্মবলিদান মোবারকের ভাবনায় মহৎ গৌরবরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবু গত্মকার পাক-মিলিটারির দৃষ্টিকোণকে তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করে গল্পের নামকরণ করেছেন 'অপঘাত'। একটি ব্যতিক্রমী ও শিল্পকৌশল হিসেবে এ নামকরণ তাৎপর্যবহ।

মূলপাঠ

ডুকরে-ওঠা কান্নার একেকটি ধাক্কায় মোবারক আলীর বন্ধ চোখের মণি কাঁপে, চোখের পাতা আলগা হয়ে আসে, তার বাঁ পায়ের পাতা শিরশির করে। দুই হাঁটুর ভেতর হাতজোড়া ভাঁজ করে ডান কাত করে শুলে বাঁ পায়ের পাতার ওপর একজিমা চুলকাবার জন্য উঠে বসার উৎসাহ পায় না। এদিকে দেখতে দেখতে কান্নার ফাঁকগুলো সব ভরে যায় এবং কান্না একটানা বিলাপে পরিণত হয়ে তার ঝুনা করোটির ভেতরকার ঠকঠক দেওয়ালে ঘনতালে বাজতে থাকে। বাজনাটা একবার বৃষ্টির বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঘরের কান্নাটির খবর বাইরে যাবে না- এই আশা করে একটু নিশ্চিত হবার আগেই বৃষ্টির বিভ্রম কাটে। বিলাপের আওয়াজ তার আঁশের মতো চুলের গোড়ায় গোড়ায় হ্যাঁচকা টান মারে। টানাটানির ফলে চোখের ঢাকনি সম্পূর্ণ উদাম হলে মোবারক কিছুই দেখতে পায় না, ঘরে ঘোনঘোট অন্ধকার। ভালো করে তাকাবার বলও তার নাই, ঘুমভাঙা শরীরে স্ত্রীর বিলাপ অবিরাম ঠেলা দেওয়ায় সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তবে কি-না মুণ্ডুর প্রতিক্রিয়ায় নিস্তেজ শরীরেও মোবারক আলি বিরক্ত হাওয়ার বলটুকু পায়: এটা কি বিলাপ করার টাইম হলো ? এই বয়সেও বুলুর মায়ের কাণ্ডজ্ঞান হলো না তো হবে কবে? ২৫০/৩০০ গজ দূরে হাইস্কুলের দালানে মিলিটারির ক্যাম্প, স্কুলের বারান্দায় গাদা গাদা বালুর বস্তার আড়ালে থাবার মতো সব হাতে ধরা রয়েছে কতো কিসিমের অস্ত্র, মোবারক ওসবের নামও জানে না, শুনলেও তার মনে থাকে না। সপ্তাহ খানেক হলো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসটাও মিলিটারি দখল করে নিয়েছে, সে তো ১৫০ গজও দূরে হবে না। বুলুর মায়ের বুকের পাঁটা কতো বড়ো যে এইভাবে বিলাপ করে কাঁদে? মেয়েমানুষের এতো সাহস ভালো না, সব ছারখার করে ফেলবে। এই বিলাপ শুনে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস থেকে দুজন সেপাই এসে পড়লে মোবারক আলির ক্ষমতা হবে যে তাদের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়? তারপর সেপাই, মানে সেপাই সাহেব যদি জিগ্যেস করে তোমার বৌ কাঁদে কেন? — তো সে কি জবাব দেবে? যদি বলে তোমার ছেলেমেয়ে কটা? — তখন না হয় বলা যাবে, জি দুই ছেলে, দুই মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে, তারা সব স্বামীদের সঙ্গে থাকে। তবে ছোট মেয়েটা দুমাস হলো এখানে এসেছে, তিনদিন আগে সে গেছে তার মামাবাড়ি। তার মামা আলেম মানুষ, ঠনঠনিয়া মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসার হেড— মোদাররেস, সারা শীতকালটা ওয়াজ করে বেড়ায়, জেলা জুড়ে তার নাম।— সেপাই ধমক দিতে পারে, আরে, এতে তার বিবির কান্নাকাটির কি হলো? ঠিকভাবে কথার জবাব দাও।— তখন বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে তার বড়োছেলের মৃত্যুই হলো তার স্ত্রীর কান্নাকাটির কারণ।— বড়ো ছেলে? — জি, আমার দুই ছেলে, ছোটটা ঘরেই আছে, ক্লাস ফোরে পড়ে।—

সেপাই চটে যাবে, বাখোয়াজি রাখো। বড়োটা মারা গেছে? কি করত? — জি, কলেজে পড়ত।- কলেজে পড়তো? মুক্তি ছিলো? কিভাবে মরলো? — হুজুর, অপঘাতে মারা গেছে। — অপঘাত? অপঘাত কেয়া হ্যায়? — না, মানে এ্যাক্সিডেন্ট হ্যায় না? হেঁ হেঁ।— ক্যায়সা এ্যাক্সিডেন্ট? সাচ বলো! এরপর মোবারক আলি আর বলতে পারবে না।— জি না স্যার, জি না হুজুর, জি না মেজর সাহেব, জি না ক্যাপ্টেন বাহাদুর, আমি কিছু জানি না।— শালা তোমার ছেলে মিসক্রিয়ান্ট ছিলো? তোমার ঘরে তুমি মিসক্রিয়ান্টের শেলটার দাও?- না হুজুর! — মিসক্রিয়ান্টের কথা সে জানে না। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলি হাজার হলেও পাকিস্তান গভর্মেন্টের চাকরি করে, জি, তার বেতন আসে বগুড়া ট্রেজারি থেকে মিসক্রিয়ান্টদের খবর সে রাখবে কোত্থেকে? — না, তার শুকনা এবং কাঠ-কাঠ গলা থেকে এইসব বাণী হাঁকা অতো সহজ নয়। মিলিটারির সঙ্গে কাল্পনিক বাক্যবিনিময়ের সংকল্পে তার বল তাই বাড়ে না। তার পাশে শুয়ে থাকা ছোট ছেলে টুলু ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি বলে, তাতে মোবারক আলির তন্দ্রা একেবারে ছিঁড়ে যায় এবং সে উঠে বসে। এখন আর শিরশির না করলেও একজিমার খানিকটা চুলকে নেয় এবং পাশের ঘরে দেড় বছরে নাতিটা হঠাৎ কেঁদে ওঠে। তখন তার মগজের ময়লা কাটে। মোবারক আলি বোঝে যে এই একটানা বিলাপের উৎস তার নিজের বাড়ি নয়। আওয়াজ আসছে দক্ষিণ থেকে। নাতি তার ফের কাঁদে এবং মোবারকের মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায় : চেয়ারম্যানের ছেলেটা তা হলে মারা গেলো।

বিকালেও সে চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়েছিলো। ইউনিয়ন কাউন্সিলে মিলিটারি ক্যাম্প হবার পর থেকে অফিসের টুকটাক কাজ সারতে হয় চেয়ারম্যানের বাড়িতে। বিকালবেলা চেয়ারম্যানের চোখমুখ একটু হালকা মনে হচ্ছিলো, শাজাহান মনে হয় একটু ভালো। না,ভালো আর কোথায়? জ্বরটা রেমিশন হচ্ছেনা, তবে একটু আগে লেবু দিয়ে প্রায় এক গাস বার্লি খেয়েছে। চেয়ারম্যান একটু আলাপও করলো, এখানে চিকিৎসা একেবারেই হচ্ছে না, অবস্থা একটু ভালো হলে বগুড়া পাঠাবে। চার গাঁয়ের এক ডাক্তার চেয়ারম্যানেরই কিরকম এক চাচাতো ভাই, একই বাড়ি, মার্চের প্রথম দিকে দিনাজপুরে শ্বশুর বাড়ি গেলো মরণাপন্ন সম্বন্ধীকে দেখতে, গোলমাল শুরু হতেই ওপারে ভাগল ওরা। আর সেরপুরের বীরু সান্যাল, পুরনো আমলের ন্যাশনাল পাশ, — ১০/১২ বছর আগেও এই গ্রামের সবাই তার কাছেই যেতো, তা শোনা যাচ্ছে বর্ডার পার হবার সময় বেয়নেটের খোঁচায় বুড়ো সাফ হয়ে গেছে।— ছেলেকে নিয়ে চেয়ারম্যান এখন যায় কোথায়? গোরুর গাড়ি করে সেরপুর পর্যন্ত না হয় গেলো, সেরপুরে জনমনিষ্যি কেউ নাই, বড়ো রাস্তায় খালি মিলিটারি খালি মিলিটারি। তা এখানে হাইস্কুল ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে চেয়ারম্যানের একটু আলাপ হয়েছে, তবে ওদের সাহায্য চাইতে ভয় হয়, ঘরে সোমত্ত বয়সের মেয়ে আছে, কিসের বিনিময়ে আবার কি চেয়ে বসে। তা দ্যাখা যাক, আজ তো বার্লি খেলো, অবস্থা একটু ভালো হোক, এর মধ্যে কি অনেকটা নর্ম্যাল হবে না? দেশের অবস্থা নর্ম্যাল হওয়ার আগেই ছেলেটা মারা গেল? তাহলে সন্ধার পর থেকে কি খারাপ হচ্ছিলো? মনসুর সরকার কয়েক বছর থেকে হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিস করে, কাউকে না পেয়ে তাকে দ্যাখানো হলো, তার ডায়াগনোসিস হলো টাইফয়েড। দুর, টাইফয়েড কি দুটো সপ্তাহ সময় দেবে না? ১০/১২ দিনেই সব শেষ হয়ে গেলো? আহা! ছেলেটার মায়ের স্বর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার সঙ্গে ছলকে ওঠে চেয়ারম্যানের মায়ের কান্না। এদের কান্নাকে মোবারক বুলুর মায়ের বিলাপ বলে ভুল করল কি করে? স্ত্রীর জন্য তার মায়া হয়, শোকে বুলুর মা একেবারে কাঠ হয়ে গেলো! বৌয়ের ওপর সে মিছেমিছি রাগ করছিলো।

বিছানা থেকে নেমে মোবারক আলি ঘরের উল্টো প্রান্তে বৌয়ের বিছানার দিকে পা বাড়ালো। তক্তপোষের কাছাকাছি যেতে পা লেগে নেভানো হারিকেনটা গড়িয়ে পড়ে। কেরোসিনের ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা আরেকটু পরিষ্কার হয়। মনে পড়ে যে নাতিকে নিয়ে বুলুর মা শুয়ে রয়েছে পাশের কামরায়। এই ঘরটায় থাকতো বুলু। মোবারক আলি একটু দমে যায়, তবু অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে বারান্দা দিয়ে সে পাশের কামরায় ঢোকে। বুলুর মা বলে ওঠে, 'আস্তে হাটো, টেবিলের উপর দুধের বোতল, কাঁচের গিলাস।' মোবারককে এইসব বলার দরকার হয় না। রাত্রিবেলা এ ঘরের ভূগোল মোবারকের মুখস্থ। আজ ২ রাত হলো বুলুর মা এখানে শোয়, কিন্তু বুলুর খবর শোনার পর থেকে মোবারক অনেক রাত্রে পেচ্ছাব করেত বেরিয়ে একবার করে এই ঘরে বসে। অল্পক্ষণ বসে, কাঠের চেয়ারে পাছা ঠেকাতে না ঠেকাতেই উঠে নিজের ঘরে যায়। কিন্তু তার জানা আছে কোথায় বুলুর তক্তপোষ, কোথায় তার কেরোসিন কাঠের টেবিল। টেবিলে পুরনো কেলেন্ডারের মলাট লাগানো বই, খাতা, দোয়াত, কলম— কিভাবে সাজানো সব তার জানা। বিছানার দিকে এগোবার বদলে মোবারক টেবিলের বইপত্র হাতড়াতে শুরু করে। বুলুর মায়ের সাড়া পেয়ে সে বিড়বিড় করে, 'দিয়াশলাই পাই না,দুর!'

'বাতি জ্বালায়ো না।' স্ত্রীর ভিজে ভিজে গলায় এই সতর্ক নিষেধ শুনে মোবারক এসে দাঁড়ায় তক্তপোষের মাথায়। মাস দেড়েক হলো প্রতিরাতে পেচ্ছাব সেরে এ ঘরে এসে ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে মোবারক বিছানাটা ভালো করে ঠাহর করার চেষ্টা করে। আজ তার মাথায় তন্দ্রার রেশ নাই, সুতরাং বুলুর ঢ্যাঙা শরীরটাকে এখানে শুইয়ে অন্ধকারে নয়ন ভরে আর দ্যাখা হয়ে ওঠে না। চোখজোড়া তাই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে এবং বিছানার ওপরকার শূন্যতা চোখের মধ্যে নুন হয়ে জমতে শুরু করলে নিজেকে সামলাবার জন্য তাকে অনাবশ্যক স্বাভাবিক গলায় বলতে হয়, 'চেয়ারম্যানের ব্যাটা বুঝি মারা গেলো!'— শাজাহানের মৃত্যু সংবাদ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার আগেই বুলুর মা ফোঁপাতে শুরু করে। এই ফোঁপানো হলো কোন দীর্ঘকান্নার রেশ। বুলুর মা তাহলে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। ঘুম ও তন্দ্রার ভেতর দক্ষিণ পাড়ার আখন্দবাড়ির বিলাপকে যখন সে স্ত্রীর কান্না বলে ভুল করে, বুলুর মা তখন কাঁদছিলোই। তবে বাইরের বিলাপের তোড়ে রোগা গলার কান্না চাপা পড়েছিলো। স্ত্রী বিলাপ করেছিলো বলে একটু আগে তার ওপরে রাগ করায় মোবারকের যে অস্বস্তির মতো হচ্ছিলো তা এখন কেটে যায়। স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হবার সুযোগটি সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করে, 'আস্তে! আস্তে কান্দো! বিপদ বোঝো না?'

চুপ করার চেষ্টায় বুলুর মায়ের কান্না আরো উথলে ওঠে। কান্নায় সম্পূর্ণ মগ্ন থাকায় এবং অন্ধকারের জন্যেও বটে, বুলুর মা স্বামীকে দেখতে পাচ্ছে না। ভয় ও রাগে মোবারক আলির চোখমুখানাকঠোঁটের ওলটপালট হবার দশা: বুলুর মা সারাটা জীবন কি অবুঝ মেয়েমানুষই থেকে যাবে? তার কান্না শুনে মিলিটারির ১ জন সেপাই যদি এসেই পড়ে তখন এই পুত্র শোকের ব্যাখ্যা করা যাবে কি করে? তখন কি খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে না? তারপর? তারপরে? তারপরের ঘটনা মোবারকের জানা আছে। তাকে ধরে নিয়ে যাবে স্কুলের দালানে, হেডমাষ্টারের কামরায় এখন টর্চারের সেল। মোবারক আলির মেরুদন্ড শিরশির করে। সুতরাং টর্চার সেলের ছবি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলার জন্য সে কাতর হয়। তার বাড়িতে ওরা নির্ঘাত আগুন ধরিয়ে দেবে। এই পুরনো মাটির বাড়ি, টিনের চাল, বাশের সিলিং— সব দাউদাউ করে জ্বলবে। আগুনের আঁচ সে এখনি অনুভব করতে পারে। তলপেটে আগুনের আঁচ লাগে। তার ভয় হয় যে লুঙিতে প্রস্রাবের ফোঁটা পড়ছে। একটু বাইরে গেলে হতো। কিন্তু এও তার জানা আছে যে বাড়ির পেছনে ভেরেণ্ডা ঝোপে বসলে গুণে গুণে ৮ ফোঁটা পড়বে কি-না সন্দেহ। সে প্রায় চিৎকার করে ধমক দেয়, 'চুপ করো, বুলুর মা চুপ করো। সোয়াগ দ্যাখাবার টাইম পাও না, না?' ধমকে কাজ হয়। বুলুর মা চুপ করে। এই সুযোগে মাথা তোলে দক্ষিণপাড়ার বিলাপ। মোবারক আলি হঠাৎ খুব জোরে নিশ্বাস ফেলে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে— চলে— যাওয়া পাছাটিকে ধপাস করে তক্তপাষের একধারে ফেলে দিলে বুলুর মা বলে 'আস্তে'! এই একটি-মাত্র শব্দে স্বামীর প্রতি তার অনাস্থা বা সাময়িক অনাস্থা প্রকাশ পায়। প্রায় মিনিটি দুয়েক পার হলে মোবারক আলির শিরদাঁড়ায় স্পন্দন থিতিয়ে আসে এবং আপোশ— আপোশ গলা করে সে বলে, 'চেয়ারম্যানের একটাই ব্যাটা গো।'

শাজাহানের জন্যে মোবারক আলির খারাপ লাগে। এই শাজাহান স্কুলে সাত বছর বুলুর ক্লাসমেট ছিলো, আহারে! না, স্কুলজীবনে দুজনে তেমন খাতির হয়নি। শাজাহান ছাত্র খুব ভালো, রাতদিন লেখাপড়া নিয়ে থাকে। বুলু গড়পড়তা ছাত্র, সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেই খুশি। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েও শাজাহানের তৃপ্তি হয়নি, আর ক'টা নম্বর পেলেই সে অনেক ভালো করতো। এই নিয়ে তার আক্ষেপের আর শেষ নাই। শাজাহান বছরের ১টা মাস কোনো না কোনো রোগে ভোগে, নইলে চেয়ারম্যান কি তাকে গ্রামের স্কুলে ফেলে রাখে? শহরে তাদের কতো আত্মীয়স্বজন, জেলা স্কুলে পড়লে কেবল রোল নম্বর নয়, খবরের কাগজে তার নামও ছাপা হতো। এস এস সি'র পর শাজাহান শুনলো না, জেদ করে ভর্তি হলো ঢাকায়। বুলু গেল বগুড়া কলেজে। অথচ, তখন থেকে দুজনের ভারি ভাব, ছুটিতে বাড়ি এলে প্রায় সারাদিন এক সঙ্গে কাটায়। শাজাহান ছেলেটি ভারি ভদ্র, বাপ চাচাদের মতো কথায় কথায় খোঁচা-মারা কথা বলে না। — বুলুর কথা ভোলার জন্য মোবারক আলি শাজাহানের কণ্ঠস্বর মনে করার চেষ্টা করে, আহা কি অমায়িক ছেলে, দ্যাখা হলেই 'পামালেকুম চাচা, বুলু বাড়ি নাই?'— আহা , সেই ছেলে কয়েকদিনের জ্বরে এভাবে— । — শাজাহানের জন্যে শোকটা তারিয়ে তারিয়ে দেখবে, তা বুলুর মা তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে ফোঁপাতে লাগলো। ছেলের শোক বহন করার চেষ্টা সে এখন করছে একা একা! মেয়েমানুষের দৌড় মোবারক আলির জানা আছে। একটু পরেই তার হাত জড়িয়ে হাউমাউ করতে শুরু করবে। কেন, ছেলেকে আগলে রাখতে পারোনি, এখন হায় হায় করে লাভ কি? বুলুটা বড্ডো বেশি বেড়ে গিয়েছিলো। মুক্তিবাহিনী করে তোরা করলিটা কি? মিলিটারি এসে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে, মরা ছাড়া তোরা আর কি বালটা ছিঁড়তে পারিস? — রাগে মোবারক আলি মনে মনে মুখ খারাপ করে। করবে না?

মিলিটারি কলেরার মতো আসে, ম্যালেরিয়ার মতো আসে। যে গ্রামে একবার হাত দেয় তার আর কোনো চিহ্ন রাখে না। গতকাল বৃহস্পতিবার গেলো, তার আগের বৃহস্পতিবার মাইল ছয়েক উত্তরে মালিয়ানডাঙায় মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এক রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিলো। একদিন পরে, শনিবার দিনগত রাত্রে সিঙড়া ক্যাম্প থেকে মিলিটারি এসে গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিলো। প্রাইমারি স্কুলটাও বাদ দেয়নি, — তা মুক্তিবাহিনী, তোরা কি করতে পারলি? সরকার বাড়ির ল্যাংড়া জমির আলির মেয়ে আর ভাইঝিকে নিয়ে গেলো। কি ব্যাপার? না, তাদের নামে কমপেন আছে।— মেয়েমানুষের নামে কমপেন? — হ্যাঁ, তারা সব ইনফর্মার, মুক্তিবাহিনীকে খোঁজখবর পাঠায়।— তাদের একজন ফিরে এলো দিন দশেক পরে। সেই মেয়েকে নিয়ে ল্যাংড়া জমির আলি যে মুসিবতে পড়েছে, কপালে তার আরো কতো কি যে ভোগান্তি আছে! — গজব! গজব! গজব ছাড়া এসব কি? — চেয়ারম্যান যে চেয়ারম্যান, — যে সরকারই আসুক, লোকটা ঠিকঠাক সামলাতে পারে, সবাইকে খশি করার মতো ক্ষমতা তার আলার রহমতে ভালোই আছে, — তো সেই চেয়ারম্যান পর্যন্ত পরশুদিন সকাল বেলা মোবারক আলিকে বলে, 'মোবারক মিয়া, ডাঙর বেটিছেলেকে বাড়িতে না রাখাই ভালো গো!'— 'কেন?'— মোবারকের অজ্ঞতায় চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়, 'বোঝেন না? ইউনিয়ন কাউন্সিলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প করিছে, একরকম ঘরের মধ্যেই ঢুকলো, না কি কন? মিলিটারি সব মানুষ তো একরকম নয়। হাতের পাঁচ আঙুল কি এক সমান হয়? আবার এটাও কই, দুই চারিটা মাথা খারাপ মানুষ না থাকলে মিলিটারি চলে না।'

চেয়ারম্যানের পরামর্শে মোবারক আলি তার ছোটো মেয়েকে পাঠিয়ে দিলো সম্বন্ধীর সঙ্গে। চেয়ারম্যানও তার মেজো মেয়েটিকে সঙ্গে দিলো। মেয়েটি বেশ ফর্সা, নাকমুখ চোখে পড়ার মতো, তাই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। মোবারক আলির সম্বন্ধী নামকরা মওলানা, জেলার নামকরা মাদ্রাসার হেড মোদাররেস, গোলমালের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ থাকায় বাড়িতেই থাকে, আলা— আলা করে, মানুষকে হেদায়েত করে, — সেটাই চেয়ারম্যানের ভরসা। কুদ্দুস মওলানা লোকও খুব ভালো। কোত্থেকে ভাগ্নের খবর পেয়ে বোন-ভগ্নীপতির সঙ্গে দ্যাখা করতে এসেছিলো। আহা, উপযুক্ত ভাগ্নে তার, তারওপর কি-না খোদার গজব পড়লো, নইলে এভাবে গুলি খেয়ে মরে? মোবারক আলি ফিস ফিস করে জানায় যে এখানে এসব নিয়ে কথাবার্তা না বলাই ভালো। মিলিটারি খবর পেলে নির্বংশ করে ছাড়বে। তা মওলানা সাহেব জবান দিয়ে গেছে, বাড়ি গিয়ে বুলুর নামে কোরান খতম করাবে, আরো যা যা করার সব করবে। তারপর মোবারক আলির এক কথায় ভাগ্নীকেও সঙ্গে নিলো, এমনকি জোহরার দেড় বছরের ছেলেটিকেও নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু মেয়ের শরীরের কথা ভেবে বুলুর মা নাতিকে রেখে দিলো। পোয়াতি মেয়ে, — জমির আল দিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে ছাপিয়ে যাবে, কোলে বাচ্চা থাকলে বিপদে আপদে সামলাতে পারবে? জামাই ঢাকায় ব্যাঙ্কের কেরানি, বৌ বাচ্চা পাঠিয়ে দিলো, — না, ঢাকায় ফুটফাট লেগেই আছে, আর এসময়টা মেয়েরা মায়ের কাছেই ভালো থাকে। মায়ের কাছে আর রাখা গেলো কোথায়? — আলা না করুক জোহরার যদি কিছু হয়! — জোহরার সম্ভাব্য বিপদের কথা মনে হলে মোবারক আলির নিয়ন্ত্রণহীন শরীর আরো এলিয়ে পড়তে চায়। শরীর সমলাবার উহ্য বাসনাতেই সে বলে, 'যাই! চেয়ারম্যানের বাড়িত যাই। একটাই ব্যাটা! কয়টা দিন খুব ভুগলো গো! চেয়ারম্যানের বৌ এই কয়টা দিন একটা মিনিট ব্যাটার কাছ-ছাড়া হয় নাই। ব্যাটা ব্যাটা কর‍্যা মনে হয় জান দিবি!'

এবার ডুকরে কেঁদে ওঠেল বুলুর মা। বলকানো কান্নার জন্য প্রথমদিকে তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো, কিছুক্ষণের মধ্যে কান্নার স্বর নিচে নামে এবং কথা স্পষ্ট হয়, 'সেই কথায় তো কই গো, হামি সেই কথাই কই!' কোন কথা তো শোনার জন্য মোবারক আলিকে আরো কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয়, 'দ্যাখো তো, চেয়ারম্যানের ব্যাটা, এ্যাঁ, তাঁই মরলো মায়ের সামনে, বাপের সামনে! মাও তো তার ব্যাটাক জান ভর‍্যা দেখ্যা লিবার পারল! আর হামার বুলু কোটে কার গুলি খায়া মুখ থুবড়্যা পড়্যা মলো গো, ব্যাটার মুখকোনা হামি একবার দেখবারও পারলাম না গো! হামার বুলুর উপরে গজব পড়ে কিসক গো? বুলু অপঘাতত মরে কিসক গো?'— এর জবাব দেয়া মোবারক আলির সাধ্যের বাইরে। বুলুর মায়ের এই বিলাপময় প্রশ্নের খাঁড়া থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্য এক্ষুণি তার বাইরে পালানো দরকার। কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে বোঝা যায়, ফর্সা হতে এখনো বাকি। অন্ধকারে বাইরে বেরুলেই গুলি করে দেবে। ১০/১২ দিন আগে সরকার বাড়ির এক বর্গাদার চাষা পিঠে গুলি খেয়ে মরলো পানধোয়া বিলের ধারে। বিলের কাছে তহসিন সরকারের নাবা জমিতে লোকটা ঘর করে থাকে, তহসিন সরকারের জমিতেই বর্গা চাষ করে। রাত্রে বিলের ধারে পায়খানা করতে বসেছিলো, হাই স্কুলের ক্যাম্প থেকে গুলি করা হয়। পেটে গুলি লেগে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে শেষ। তারপর হাই স্কুলের দপ্তরি নজীবুল-

ার পিঠে গুলি লাগলো, সেও রাত্রেই। নজীবুলা গিয়েছিলো বেলকুচি হাটে। মিলিটারি ক্যাম্প হাওয়ায় এদিককার হাটবাজার সব লাটে ওঠার অবস্থা, — গত বছরের সের পাঁচেক মরিচ ছিলো, তাই বিক্রি করতে নজীবুলার বেলকুচি যাওয়া। ফিরতে একটু রাত হয়েছিলো, রাত আর কত, এই এশার আজান দিয়েছে কি দেয়নি, স্কুলের সামনে দিয়ে সে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে তো মিলেটারি তাকে হুঙ্কার দিয়ে থামতে বলে। নজীবুলা থামবে কি, পড়িমরি করে দৌড় দেয় সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি এসে লাগে তার পিঠে। মনে হয় গুলি লাগার পরেও লোকটা দৌড়েছিলো, তার লাশ পাওয়া যায় আমিনুদ্দিন সরকারের বাঁশঝাড়ের ভিতর। আমিনুদ্দিন সরকার ভাইপো তবারক, লাঠিডাঙার আয়নুল, পদুমশহরের হাশেম এন্ডল, হাই স্কুলের অঙ্ক স্যার নুর মোহাম্মদ— এদের মারা হয়েছে লাইনে দাঁড় করিয়ে, স্কুল দালানের পিছনে, ছোটো ক্লাসের ছেলেরা যেখানে দাড়িয়াবান্ধা, গোলাছুট, হাডুডু খেলতো সেখানে এদের পুতে রাখা হয়েছে। বিলের ধারে লাশ, বাঁশঝাড়ে লাশ, স্কুলের পিছনে লাশ, — তাইতো একটা মাস যতোগুলো মানুষ পড়লো সবকটা গুলি খেয়ে মরছে— । — সব্বাই! তাই তো!— সকলের অপঘাত মৃত্যু। এমনকি পুব অঞ্চলে বিয়ে হয়েছে তার খালাতো বোন আমেনাবুবুর, সে মেলা দূর, যমুনার তীরে কেষটিয়া গ্রাম, প্রত্যেক বছর বর্ষাকাল আসে আর তারা নদীভাঙার ভয়ে তটস্থ হয়ে ওঠে; এবার এসেছে নদীর বাপ মিলিটারি। আমেনাবুবুর দেওরের ছেলে আলি আকবর, চন্দনবাইসা কলেজে আই. কম পড়ে, তাকে গুলি করে ফেলে দিয়েছে যমুনায়। চন্দনবাইসা তহশীলদার অফিসে মিলিটারি ক্যাম্পের সামনে ছেলেটা ধরা পড়ে, তার কাছে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিলো। আহা, বেচারা বংশের একমাত্র ছেলে, ঐ বাড়িতে আর সবকটা মেয়ে, ছেলেটাকে খুব কষ্ট দিয়ে মেরেছে। না,না, বুলুকে কিন্তু কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। ধরা পড়ার আগেই ও গুলি খায়।— সেই অজ্ঞাত জায়গায় অশ্রুত গুলির শব্দে মাথাটা দুলে ওঠে, হঠাৎ মনে হয়, তাইতো, কয়েক মাস এই এলাকায়, এমন কি কোন পুব অঞ্চলে কেষটিয়া গ্রাম, সেখানে পর্যন্ত— সবাই মারা গেছে গুলি খেয়ে। সব অপঘাতে মৃত্যু, স্বাভাবিকভাবে লোকে মরে না, গজব, আলার গজব, গজব না পড়লে মানুষের এরকম মৃত্যু হয়? — চেয়ারম্যানের ভাগ্য!— তার ছেলেরই এমন স্বাভাবিক মরণ। এসব ভাগ্যের ব্যাপার। চেয়ারম্যান লোকটার সবদিকেই ভাগ্য ভালো, তার জমিতে ফসল হয় সবচেয়ে ভালো, যেবার যা বোনে সেবার তাতেই লাভ থাকে। ধান বলো, মরিচ বলো, পেঁয়াজ বলো,আলু বলো চেয়ারম্যানের জমিতে যার ফলন ভালো সেই ফসলের সেবার দাম উঠবে। আবার দ্যাখো না, তিন তিনবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলো, ইলেকশনে লোকটা কখনো হারে না। একমাত্র ছেলে, ছাত্র কতো ভালো,গত কয়েক বৎসর এই স্কুল থেকে তার মতো রেজাল্ট কেউ করতে পারেনি। আবার দ্যাখো সবাই যখন এদিক ওদিক মরছে, চেয়ারম্যানের ছেলে তখন মায়ের কোলে দোল খেতে খেতে চোখ বুজে। এটা ভাগ্য ছাড়া কি? — দীর্ঘ নিশ্বাস চাপার জন্য মোবারক আলি একটু কাশে। আর বুলু— কি সুন্দর ছেলে, আর কি রকম ঢ্যাঙা হয়ে ওঠেছিলো, তাই না? — মাথায় মোবারক আলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো, ও ঠিক ওর দাদার মতো হতো, — সেই ছেলে, দিব্যি ভালো ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো, ৪ মাস পর খবর এলো যে সে গুলি খেয়ে মারা গেছে। কোথায়? না, সে এখান থেকে মেলা দূর। একই জেলা, তবে সে হলো পুবের পলি এলাকা। হ্যাঁ, আমেনাবুবর শ্বশুর বাড়ির কাছেই হবে। গ্রামের নাম তার জানা নাই।

দেড় মাস আগে বুলুর মরার খবর পেয়ে মোবারক ভেবেছিলো যে বৌয়ের কাছে খবরটা একেবারে চেপে যাবে। তো শোনার পর কয়েকটা ঘন্টা সে চুপ করেই ছিলো, তাও যে ছেলেটি খবর নিয়ে এসেছিলো তার বিশেষ অনুরোধে। অনুরোধ না বলে আদেশ বলাই ঠিক, যাদের হাতে অস্ত্র থাকে তারা কি অনুরোধ করতে পারে? ছেলেটার নাম যেন কি? — না, নামটা মনে না করাই ভালো, বাড়ির কাছে মিলিটারি ক্যাম্প, কখন কে এসে ধমক দিলেই মোবারক আলি তার নাম ফাঁস করে দেবে। নাম মনে না থাকলে কি হয়, তার চেহারা প্রায় ২৪ ঘন্টা মোবারক আলির সামনে দোলে। ঘন কালো মেঘের সামনে শ্যামবর্ণ একখানা মুখ। ও যখন আসে তখন বিকালবেলা। খুব মেঘ করায় অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। মোবারক হাট থেকে ফিরছিলো পা চালিয়ে। এদিকে, এই ৫/৬/৭ মাইলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প তখনো হয়নি, তাই আকাশে জমাট মেঘ ছাড়া জোরে হাটার অন্য কোনো কারণ ছিলো না। ছেলেটিকে সে প্রথম দ্যাখে, বড়োমিয়ার আউশের জমির পাশে সাইকেল ঠেলে ঠেলে নালা পার হচ্ছিলো। তারপর সাইকেলে উঠে ছেলেটি তাদের গ্রামের দিকে চলে যায়। পাকুড় গাছের তলায় এসে রাস্তা হঠাৎ বাক নিয়েছে, ছেলেটি সেখান থেকে আড়াল হয়ে পড়লো। তার দিকে মোবারক আলি ভালো করে লক্ষ্যও করেনি। হাটে শুনে এসেছে যে সেরপুর শহরে মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর তছনছ করে ফেলছে। তারপর বগুড়ায় নাকি মিলিটারির বিরাট আড্ডা। মানুষের লাশের গন্ধে নাকি শহরে

ঢোকা যায় না। আবার এরই মধ্যে কোন এক বড়ো মিলিটারি অফিসারকে মেরে ফেলেছে কারা। বর্ডারে জোর যুদ্ধ চলছে। এবার পাটের দর বাড়তে পারে। হাটের ভেতরই লোকজন ফিসফিস করে এইসব আলোচনা করে। মোবারক আলি ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসের সামনে এসে পড়ে, না সাইকেলের তখন চিহ্ন মাত্র দ্যাখা যায় নি। অফিসের পাকা বারান্দায় উঠে মোবারক অফিস ঘরের তালা দুটো একবার টেনে দ্যাখে। না, ঠিক আছে। এ পর্যন্ত ভুল তো কোনো দিন হলো না, তবু যতবার এদিক দিয়ে যাবে, — তা সে জমি দেখতে হোক কি হাটে বাজারে হোক বা বিলে মাছ ধরতে হোক— বারান্দায় উঠে তালা দুটো তার পরীক্ষা করা চাই। বারান্দায় দাড়িয়ে সে একবার আকাশের মেঘের ভারটা ঠাহর করার চেষ্টা করলো। না, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া দরকার। বারান্দা থেকে নিচে নামছে এমন সময় অফিসের পেছন থেকে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো শুকলু পরামানিক। শুকলুকে দেখে মোবারক ভ্রূ কোঁচকায়: এইসব চাষাভুষাদের মানুষ করা তার বাপের সাধ্যের বাইরে। এতোবার বারণ করা হয় তবু শালাদের হাগামোতা সব এই অফিসের পিছনে। চেয়ারম্যান সাহেব এতো সখ করে শেফালির চারা লাগিয়েছে, তা এদের গুয়ের গন্ধে ওদিকে উঁকি দেওয়া যায়না। কিন্তু তাকে ধমক দেওয়ার আগেই শুকলু বলে, 'চাচামিয়া, একটা চ্যাংড়া আপনের ঠিকানা পুস করিচ্ছিলো। সাইকেল লিয়া আচ্চে।'

'কেটা?'

'কে জানে বাপু? হামি পুস করনু তো ক'লো বুলুর সাথে কলেজত পড়ে। হামাগোরে ইখানকার মানুষ লয় গো চাচামিয়া। হামি এক লজর দেখ্যাই বুঝিছি টাউনের মানুষ'!

'নাম পুস করিছিস?'

'ক্যাঙ্ক কর‍্যা করি? এ্যানা কথা কতে না কতে সাইকোলোত উঠ্যা তাঁই হাঁটা দিলো।'

বুলুর ক্লাসমেট? মোবারক আলি যতো তাড়াতাড়ি পারে ছুটতে লাগলো। আজ ৪ মাস বুলুর দ্যাখা নাই। মার্চের মাঝামাঝি বাড়ি এলো। এখানেও তখন খুব তোড়জোড়। রাস্তায়, হাটে, বাজারে পুকুরের ধারে খালি মিছিল। গাঁও-গেরামে এতো মানুষ কোনো দিন দ্যাখা যায় নাই। মানুষ ফুলে ফেঁপে উঠছিলো। মানুষ হয়তো ২০টা কি ৩০টা, কিন্তু ওদের চিতানো বুক দেখে মনে হয় একেকজনের গায়ে ১০ মানুষের বল। বুলুর খাওয়া নাই, গোসল নাই, খালি এ-গ্রাম ও-গ্রাম করে, জোয়ান জোয়ান ছেলেদের নিয়ে প্যারেড করে, এইসব কালোকিষ্টি চাষাভুষা রাখালদের নিয়ে সে যেন জগৎ জয় করবে। ছেলেটা হঠাৎ ঢ্যাঙা হয়ে গেছে শহরে দূর সম্পর্কের মামাবাড়িতে থাকে, কি খায়,কি পরে— অথচ দেখতে দেখতে তাগড়া জোয়ান হয়ে গেলো। মার্চের শেষে ঢাকায় মিলিটারিরা মানুষ মারতে শুরু করলো, আর বগুড়া থেকে শুরু হলো মানুষ আসা। বগুড়ায় মিলিটারিকে ঢুকতে দিচ্ছে না, শহরের উত্তরদিকে ব্যাংকের দালানের ওপর পজিশন নিয়ে ছেলেরা ফাইট করে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান একদিন এসে অভিযোগ করে, 'মোবারক মিয়া, বুলু এই গোলমালের মধ্যে যাচ্ছে, আপনে শাসন করিচ্ছেন না? আবার শাজাহানক খালি খালি চেতাচ্ছে, শাজাহান স্কলার ছাত্র, ওর কি ইগলান করা মানায়, কন?' তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'কি পাগলামি শুরু করিছে, কন তো! চ্যাংড়া প্যাংড়ার মাথার মধ্যে পোকা ঢুকিছে। গাদাবন্দুক আর দাও কুড়াল খন্তা লিয়া মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করবি, এ্যাঁ?' মোবারক আলিও এসব বোঝে। কিন্তু বুলুকে বোঝাবার আগেই সে একদিন উধাও হয়ে গেলো। ৪দিন যায় ৫দিন যায় তার পাত্তা নাই। খবর আসে যে বগুড়ায় মিলিটারি ঢুকে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে মানুষের ঢল আসে, এইগ্রামের ভেতর দিয়ে মানুষ যায়, বেশির ভাগই ভদ্দরলোক। তাদের কি সুন্দর সুন্দর মেয়ে। চশমা চোখে জুতা পায়ে হাটে! জীবনে গ্রামে আসেনি, তারা হাঁটতে হাঁটতে টলে, টলতে টলতে পড়ে যায়। সেরপুর থেকে মানুষ পালালো। এমনকি ব্যাংক ভেঙে টাকা নিয়ে নেতারা পর্যন্ত এই পথ দিয়ে বর্ডারের দিকে চলে গেলো। সেই টাকা দিয়ে তারা দেশ স্বাধীন করবে। কিন্তু বুলুর দ্যাখা নাই। বাড়ির দিকে যেতে যেতে মোবার রেক বুক টিপটিপ করে। বয়স তো হলো, এখন কি অমনি করে ছোটা যায়? সাইকেল ওয়ালা ছেলেটি হয়তো বুলুও হতে পারে। ছদ্মবেশ ধরে এসেছে। শুকলু হয়তো চিনতে পারেনি। এরকম হতে পারে না? — না।— এরকম যে হয়নি সে ক্ষোভ মোবারকের আজও কাটেনি। ছদ্মবেশী বুলুকে দ্যাখার আশাভঙ্গের দৃশ্যটি সে তাই মুছে ফেলতে চায়। শুকলু পরামাণিকের কথাবার্তা বরং আরেকবার শোনা যায় না? না, তাও যায় না। এর সপ্তাহ দুয়েক পর গ্রামে যখন মিলিটারি ঢোকে, শুকলু তখন বড়োমিয়ার জমিতে কাদামাটিতে উপুর হয়ে বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলছে। জিপের আওয়াজে সে চমকে উঠে দাঁড়ায়। তার হাত ১ আঁটি কলাপাতাসবুজ ধান গাছের চারা এবং চোখে

বোকাবোকা ভয়। মিলিটারি সোজা গুলি করে তার পেটে।— মিলিটারি কি বুলুরও পেটে গুলি চালিয়েছিলো? — অন্ধকার ঘরে নাতিকে নিয়ে শুয়ে থাকা স্ত্রীর পাশে বসে মোবারক আলি নিজের পেটে আস্তে আস্তে হাত বুলায়। পেটের বাঁ কোণে তার বহু দিনের একট চিন-চিন ব্যথা ছিলো, আজ মাস তিনেক হলো সেটা বোঝা যায় না। নিজের পেটে গুলিবারুদ পেতে নিয়ে বুলু কি তার পেটের ব্যথা চিরকালের জন্য শুষে নিয়ে গেছে? মোবারকের মনেই থাকে না যে সাইকেলওয়ালা ছেলেটি বুলুর মৃত্যুর যে বিবরণ দিয়েছে তাতে পেটে গুলি লাগার কোনো কথা নাই। হয়তো একটু পরেই তার মনে পড়তো, কিন্তু ফের প্যানপ্যান করতে শুরু করে বুলুর মা, 'একবার চোখের দ্যাখাটাও দেখবার পারনু না গো। কোটে কোন পাথারের মধ্যে একলা একলা দাপাদাপি কর্‌্যা মরলো, মুখোত এ্যানা পানিও পালো না গো। হামার ব্যাটার উপরে ইস্কা গজব কিসক পড়লো গো? আলার বিচার ক্যাক্কা কও তো? তার মাটিও হয় না, কোটে কোন কাদোর মধ্যে পড়্যা থাকে, কও তো!'

'থামো'। মোবারক আলি ভয় পায় যে বুলুর মা এবার চ্যাঁচাতে শুরু করবে, 'থামো। মাটি হয় নাই তোমাকে ক'ছে?'

'তুমি একবার দেখবার গেলা না কিসক?' বুলুর মা রাগ করে, 'তুমি যায়া তার কবর জিয়ারত কর্‌্যা আসলা না কিসক! অপঘাত, তো মরছে, তো তাঁই কি তোমার ব্যাটা লয়? পাষাণ বাপ হছো, ব্যাটা তোমার লিজের পয়দা লয়?' — রাগ করতে চাইলেও বুলুর মা রাগ টিকিয়ে রাখতে পারে না। রাগ তার মুখ থুবড়ে পড়ে শোকে, শোকে এবং ভয়ে, নাতির ঘুম ভাঙার ঝুকি থাকা সত্ত্বেও মোবারকের উরুর উপর একটি রোগা কালো হাত রেখে সে ফোঁপায়, 'হামরা কি গুনা করছিলাম গো, হামাগোর উপরে গজব পড়ে কিসক? হামাগোর ব্যাটা অপঘাত 'মরে কিসক গো' মোবারক আলি ভয় পায়। ছাদের ফুটো দিয়ে বাঁশের সিলিং ফুঁড়ে ঘরে আলো ঢুকছে। মোবারক জানালা খুলে দেয়, ভোরবেলার লালচে শাদা আলোয় আকাশ গাছপালা ও মাটি যেন স্বপ্নের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। ঝিরঝিরে বাতাস ঢুকে মশারি কাঁপায়। জোহরার ছেলেটি হাতপা ছড়িয়ে ঘুমায়, বাতাসের ঝাপ্টায় ঘুম গাঢ় হয়।

মোবারকের একটু ভয় হলো, তার বোধ হয় দেরি হয়ে গেলো। চেয়ারম্যানের বাড়িতে এর মধ্যেই মেলা লোক এসে পড়েছে। বাইরে আমতলায় হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসেছিলো কাবেজউদ্দিন। এদের বাড়ির পুরনো কাজের লোক, বুড়ো হয়ে গেছে, দুটো চোখেই ছানি পড়তে শুরু করেছে, একটু কাছে না এলে লোক চিনতে তার কষ্ট হয়। মোবারক তার পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে,' কাবেজ, চেয়ারম্যান সাহেব কৈ?' 'তাঁই না আপনাক উটকাচ্ছিলো!' চেয়ারম্যান তাকে খুঁজছিলো শুনে মোবারক আলি ঘাবড়ে যায়, তার আরো আগে আসা উচিৎ ছিলো। শুকনা গলা করে ফের জিগ্যেস করে, 'সমাচার কি?' 'ফজরের আগে, আন্ধার থাকতে মিলিটারি খবর দিয়া চিয়ারম্যানোক লিয়া গেছিলো। তাঁই কলো, মোবারক মিয়া থাকলে একসাথে গেলামনি।'

দ্যাখা হলে চেয়ারম্যান কিন্তু এসব কিছুই বলে না। মোবারক আলিকে জড়িয়ে ধরে লোকটা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। তাকে নিয়ে মোবারক ভেতরের বারান্দার কোণে জলচৌকিতে বসায়, নিজেও পাশে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ারম্যান চোখ মোছে, সে আবার নিজের স্বভাবে ফেরার চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে বলে, 'মোবারক মিয়া, সাজু তামাম রাত খালি বুলুর কথাই ক'ছে। রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় প্রলাপ শুরু হলো যতোক্ষণ প্রাণ ছিলো শুধু বুলুর কথা কয়!' যে জলচৌকিতে তারা বসে ছিলো তার সঙ্গেই চেয়ারম্যানের শোবার ঘরের দরজা। সেই ঘর থেকে চেয়ারম্যানের স্ত্রীর কান্নার শব্দ আসছিলো। স্বামীর কথা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিলাপে সে ছেলের শেষ কথাগুলো যোগ করে, 'খালি বুলু,খালি বুলু! তামাম রাত খালি বুলুক ডাকে, খালি বুলুকই ডাকে। বুলুর সাথে চল্যা যামু, — বুলুক কও আমাক না লিয়া যেন যায় না। ও মা 'বুলুক আটকাও, আমাক ছাড়া উঁই গেলো'।

মোবারকের মাথা দুলে ওঠে। এই দুলুনি সারা শরীর চালান হয়ে গেলে সে বেশ চাঙা হয়; এতোটাই চাঙা যে শাজাহান বুলুর সঙ্গে কোথায় যেতে চেয়েছিলো জানার জন্য প্রবল আগ্রহ বোধ করে। চেয়ারম্যানের বৌ এবং এই বাড়ির এক পুরনো দাসী মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত শাজাহান যা কিছু প্রলাপ করেছে তার সবই অত্যন্ত এলোমেলোভাবে উদ্ধৃত করে চলে। শাজাহান তার মা,ভাই, বোন কারো সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। এক ঢোক পানি খাবার জন্য এদিক ওদিক তাকায়নি। একবারও বলেনি, মা, আমার মাথাটা টিপে দাওনা। মউত এলে মানুষ আজরাইলকে দেখে ভয়ে চোখ বড়ো করে ফেলে, কিন্তু শাজাহানের চোখ খালি অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছিলো বুলুর খোজে; তার শুধু এক কথা, বুলুকে ডাকো, আমি বুলুর সঙ্গে যাব। চেয়ারম্যানের বৌ জানায় যে এইসব শুনেই বুকের মধ্যে সে সঙ্কেত পেয়েছে, তার শাজাহান বাঁচবে না।

— স্ত্রীর এইসব বিলাপে চেয়ারম্যান উসখুস করে, পুত্র বিয়োগ তার বিবেচনাবোধ বিনাশ করতে পারেনি। সে এখনো ভালোভাবে জানে যে বৌ-ডোবা খালের ব্রিজে মিলিটারি জিপ উড়িয়ে দেওয়ার পর পরই বুলুর নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে মোবারক তো মোবারক, এই গ্রামের ১টি মানুষকেও আস্ত রাখা হবে না। চেয়ারম্যান এ পর্যন্ত খবরটা গোপন রেখেছে, কিন্তু বৌকে কোন কথাটা না বলে থাকা যায়? এখন চেয়ারম্যান থামায় কি করে? বাড়ির পাশে মিলিটারি, তাদের কানে খবরটা গেলে গ্রামে কেয়ামত ঠেকাবে কে? — কিন্তু মোবারক আলির রক্তমাংসহাড্ডিমজ্জা সব তোলপাড় করে ওঠে, বুলুর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে শাজাহান তাহলে অস্থির হয়ে উঠেছিলো! শাজাহান আর কি বলেছিলো? — কিন্তু সে সব বিস্তারিত জানার উপায় নাই। কারণ চেয়ারম্যানের বৌয়ের বিলাপ এখন চাপা পড়েছে বুলুর মায়ের হামলানো কান্নায়। এই বারান্দারই অন্য প্রান্তে শাজাহানের লাশ। লাশের মুখ থেকে কাপড় সরাতেই বুলুর মা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। তার কান্না বাজে সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে। এর ফলে মেয়েদের মধ্যে যাদের কান্না নিস্তেজ হয়ে এসেছিলো তারা ফের নতুন করে কাঁদতে থাকে। মোবারক আলি উঠে লাশের দিকে চলে যায়। না, বৌকে থামাবার কোনোরকম ইচ্ছা তার নাই। কাঁদবার এরকম সুযোগ বুলুর মায়ের কতোদিন জোটেনি, আবার কবে জোটে কে জানে। যতো খুশি সে কেঁদে নিক, মোবারক তাকে একটুও বাধা দেবে না। তার নিজের চোখ একেবারে খটখটে, সেই পরিষ্কার শুকনা চোখে সে শুধু শাজাহানকে একবার ভালো করে দেখবে।

মরার পরও শাজাহানের ভ্রুর মাঝখানে ছোটো একটা ভাঁজ। সামনের দুটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে নিচের পাতলা ঠোঁট। বুলুর সঙ্গে বৌডোবা খালের ব্রিজে গ্রেনেড মারার সুযোগ না পাওয়ার ক্ষোভ কি এখনো ভ্রুতে, গালে,দাঁতে ও ঠোঁটে বিঁধে রয়েছে? বুলুর সঙ্গে এর চেহারার কোনো মিল নাই— বুলু শ্যামবর্ণের,এর গায়ের রঙ ফর্সা,বুলুর গাল ভাঙা, কয়েক দিনের জ্বরে মলিন হলেও শাজাহানের গালের ফোলা ফোলা ভাবটা রয়েই গেছে। মিলিটারির জিপ উল্টিয়ে দেওয়ায় বুলু হয়তো এরকম অসন্তুষ্ট মুখ করে মরেনি। কে জানে, শাজাহানের বুকে হয়তো গুলির দাগ ২/১টা লেগে থাকতে পারে। গুলিটাতো বুলুর বুকেই বিধেঁছিলো। সাইকেলওয়ালা ছেলেটি তো তাই বলে গেছে।— সন্ধ্যার পর পরই সেদিন খুব চেপে বৃষ্টি আসে। এমনি অন্ধকার, তার ওপর দেওয়ালের মতো বৃষ্টি। ছেলেটির বাইরে যাওয়ার উপায় ছিলো না। সেই রাত্রেই তার চলে যাওয়ার কথা, বৃষ্টিতে আটকে না পড়লে হয়তো এত কথা বলতো না। ওরা সব কাজের ছেলে, নিহত বন্ধুর বাপের সঙ্গে এতো কথা বলার সময় কোথায়? ছেলেটি এদিকে এসেছিলো ভবানীহাট গ্রামে, এখান থেকে মাইল দুয়েক পথ। কি কাজ আসে তা এক বারোও বললো না, খালি বলে ওদিকে ওদের লোক আছে। ফেরার সময় তার মনে হয় যে সুলতানদের গ্রাম তো এদিকেই, একবার ওর বাবার সঙ্গে দ্যাখা করে যাবে। সুলতান হলো বুলুর ভালো নাম, ওর কলেজে এই নামেই বুলু পরিচিতি। সাইকেলওয়ালা ছেলেটি এক ক্লাস ওপরে পড়ে, বগুড়া শহরের মিলিটারিদের কব্জায় চলে গেলে ওরা একসঙ্গে পূর্বদিকের গ্রামে পালায়। ছেলেটি অনেকক্ষণ পরপর কথা বলছিলো, প্রথমদিকে খুব রেখে ঢেকে, খুব সাবধানে। পরে আস্তে আস্তে সব বলে ফেলে। বুলুর মৃত্যুর সময় ওদের আরেক বন্ধুর সঙ্গে এই ছেলেটিও ছিলো। জায়গাটার নাম? — এখান থেকে সেরপুর গিয়ে সেরপুর হাটের ওখানে করতোয়া পার হয়ে যেতে হয়। ওসব জায়গা মোবারক আলি চেনে। তারপর? তারপর চওড়া কাঁচা রাস্তা চলে গেছে একেবারে যমুনার পশ্চিম তীর পর্যন্ত। যমুনার কাছাকাছি, যমুনা থেকে সোয়া মাইল কি দেড় মাইল হবে, সেখানে বৌডোবা খাল। তারপর? ধূনট বাজারে মিলিটারির ক্যাম্প বসেছে।

ধূনট থেকে আরো অনেকটা পূর্বে দেবডাঙা গ্রাম। দেবডাঙায় মুক্তিবাহিনী তখন কেবল এসে জমা হচ্ছে। ঐ গ্রামের এক দালাল শালা ধূনটে গিয়ে খবরটা পৌছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। তা ওরাও খবর পেয়ে যায় যে মিলিটারি এদিক আসছে। ধূনট-দেবডাঙা রাস্তায়, দেবডাঙার একেবারে কাছে বৌডোবা খাল। রাস্তা আড়াআড়ি চলে গেছে। এই খালের উপর ছোটো পাকা ব্রিজ। ওরা ৩ জন মাইন পুততে যায় ব্রিজের নিচে। মাইন পোঁতার কাজ শুরু করবে এমন সময় জিপের আওয়াজ। জিপ যে এতোতাড়া তাড়ি আসবে ওরা তা ভাবেনি। সঙ্গে সঙ্গে ৩ জনেই নেমে পড়ে রাস্তার ধারে। নিচু জমি, ঘন পাটখেতে, মানুষ সমান পাট। পাটখেতে ঢুকে নিশ্বাস বন্ধ করে ৩ জনেই জিপের অপেক্ষা করে। এই ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা খারাপ, ব্রিজ কোনোমতে পার হলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে দেবডাঙা। মুক্তিবাহিনীর ছেলেগুলো একটু তৈরি হবার সময় পাবে না। উঁচুনিচু রাস্তায় টলোমলো চাকায় জিপ যখন ব্রিজের ওপর উঠেছে, বুলু করলো কি, পাট খেত থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে দিলো জিপ লক্ষ করে। অব্যর্থ লক্ষ। ড্রাইভারের পাশে বসা অফিসার একেবারে সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজ ডিঙিয়ে নিচে পড়ে যায়। নিচে বৌডোবার খালে তখন ৫ হাত পানি। ড্রাইভার সামলাতে না পারায় গাড়ি

গড়িয়ে পড়ে যায় ব্রিজের আগে রাস্তার ঢালুতে, সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে ফের খালের মুখে আটকে গেলো। বুলু এবং সেই ছেলেটি তখন দৌড়ে গেলো জিপের দিকে, রাস্তার অন্য ঢালে জিপ, সুতরাং রাস্তা ক্রস করা দরকার । ওদের এখন অস্ত্র চাই। স্টেনগান মেশিনগান তখনো ওরা চোখে দ্যাখেনি, এই থানা টানা থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া থ্রি নট থ্রি, গাদাবন্দুক এবং দুদিন আগে পাওয়া কয়েকটা গ্রেনেড ওদের সম্বল। কিন্তু জিপ থেকে এক সেপাই যে আগেই লাফিয়ে পড়েছে তা বোঝা যায়নি। ওদের রাস্তায় উঠতে দেখে লোকটা গুলি ছোঁড়ে রাস্তার ঢাল থেকে। দুটো গুলি লাগে বুলুর বুকে। লোকটা তারপর সোজা ছুটতে থাকে ধূনটের দিকে। কিন্তু বুলুর সঙ্গীদের রাইফেলের গুলি সে এড়াতে পারেনি। তার পায়ে গুলি লাগে, কিন্তু সে তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। আহত সেপাইকে ওরা ধরতে যাবে কি-না ঠিক বুঝতে পারছে না, এমন সময় ফের মিলিটারি গাড়ির শব্দ আসে। ওদের দুজনকে ফের ঢুকতে হয় পাটখেতের ভেতর। আহত সেপাইটিকে হয়ত একটি গাড়ি ঠিক তুলে নিয়েছে। তবে গাড়ি গুলো ব্রিজের এখানে এসে এক পলকের জন্যেও গতি কমায় নি। কিছুক্ষণ পর দেবডাঙার দিক থেকে পাল্টাপাল্টি গুলিবর্ষণের শব্দ আসে, প্রায় মিনিট ১৫ ধরে ক্রস-ফায়ারিং চলে। এরপর দারুণ নীরবতা। আরো কয়েক মিনিট পর সেদিকে আগুনের মস্ত শিখা চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সাংঘাতিক কোলাহল ও আর্তস্বর। গ্রামের লোকজনকে পালাতে হয় যমুনার দিকে, নয়তো মাঠ পার হয়ে তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তাটি কেউ ব্যবহার করতে পারেনি, রাস্তার মুখে কড়া মিলিটারি। বুলুর সঙ্গী দুজন সারারাত এবং পরদিন বিকাল পর্যন্ত পাটখেতেই ছিলো। এর মধ্যে মিলিটারি জিপ বেশ কয়েকবার রাস্তা দিয়ে ধূনট- দেবডাঙা করে।

'বুলুর লাশ?'

ছেলেটি মাথা নিচু করে ছিলো। — না,না তাকে বিব্রত করতে চায়নি মোবারক, এমনি জিগ্যেস করেছিলো। বুকে গুলি লেগেছিলো? — হ্যাঁ, দুটো গুলি। বুলু তখনো রাস্তায় সম্পূর্ণ ওঠেনি, রাস্তার অন্য ঢাল হতে গুলি ছোঁড়া হয় বলে তারা কেউ সাবধান হতে পারেনি। বিপরীত ঢালে সে পড়ে যায়। — চিৎ হয়ে? — হ্যাঁ, চিৎ হয়ে। তার মাথা ছিলো নিচের দিকে, শরীরটা ওপরের দিকে। — খালের পানিতে মাথা ডুবে যায়নি? — চুলগুলো পানি ছুঁয়েছিলো। — তারপর ছেলেটা এ সম্পর্কে আর তেমন কিছু বলেনি। গুলি দুটো ঠিক কোথায় ঢোকে? — না, সে কিছুই না বলে উঠে পড়ে। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে, অন্ধকার ও টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে সে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখে। এখন শাজাহানের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে তার বুকটা এক নজর দ্যাখার জন্য মোবারক আলির চোখ জোড়া নিসপিস করে।

সে নিজেও ঠিক জানে না কেন, হয়তো এই উদ্দেশ্য কিংবা এমনি প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যের খাতিরে বা ওপরওয়ালা চেয়ারম্যানের মন যোগাবার জন্য বা ছেলের সহপাঠীর প্রতি ভালোবাসা— যে কোনো কারণে মোবারক আলি এগিয়ে যায় উঠানে চাদর ঘেরা জায়গায়। সেখানে তখন শাজাহানের লাশ ধোয়া হচ্ছে। কাবেজ খুব যত্ন করে সাবান মাখায় আর বিড়বিড় করে, 'ছোটো থাকতে বড়ো দীঘীত নিয়া কতো গোসল কর‍্যা দিছি, কি দাপাদাপি করিছে। এখন তাঁই একটা কথাও কচ্ছে না গো।'

নাঃ! শাজাহানের মৃতদেহে কোথাও গুলির একটি চিহ্ন পর্যন্ত নাই ব্যাপারটা মোবারক আলি এতো স্পষ্ট করে মনে হয়নি! কিন্তু তার নিজের চোখ জোড়া বড্ডো পরিষ্কার ঠেকে। বুলুকেও ভালোভাবে দ্যাখা যায়, শাজাহানকেও দ্যাখা যায়। বুলু এবং শাজাহান সম্পূর্ণ আলাদা ২ জন যুবক। চোখের মাধ্যমে সে মাথার জট খুলতে থাকে এবং শাজাহানের শেষকৃত্যের দায়িত্ব এসে পড়ে প্রধানত তার ওপরই। চেয়ারম্যান তাকেই বলে যে একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার, ভোর হবার আগেই স্কুল দালান থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলো। — এতো চ্যাঁচামেচি কিসের? মিসক্রিয়েন্টারা কি তার বাড়ি এ্যাটাক করল? — না তার ছেলে মারা গেছে। — তাহলে যতো তাড়াতাড়ি পারে, এই ২/৩ ঘন্টার মধ্যেই যেন দাফন করা হয়। দরকার হলে তার ট্রপ তাকে সাহায্য করবে। — সাহায্য-প্রস্তাব অনেক কষ্টে এড়ানো গেছে,এখন দেরি হলে আবার ট্রপ যদি চলে আসে! বাড়িতে বৌ-ঝিয়েরা আছে। জুম্মাঘরে জানাজা হয়ে গেল বেলা সাড়ে ১০ টার মধ্যে।এদের পারিবারিক গোরস্থানটা বাড়ি থেকে একটু দূরে, ৪০০/৪৫০ গজ পথ পার হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিলের সামনে কয়েক জন সেপাই পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এতো লোক এক সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে? — চেয়ারম্যান ছিলো মোবারকের পাশে, মোবারকের ডান কাধে খাটিয়ার একটা কোণ। মোবারক গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, 'লাশ হ্যায় খান সাব, চেয়ারম্যান সাহেবের লড়কা।'

তাদের ক্যাম্পের সামনে দিয়ে এতোগুলো মানুষ একসঙ্গে যাওয়া নিষেধ। জুম্মাঘরের ঈমাম-কাম-মোয়াজ্জেন মিনমিন করে, 'মুসলমান কা লাশ খানসাব। দাফন কা লিয়ে লে রহা। মেহেরবানি করকে — ।'— না, সৈন্যরা কোন ঝুকি নেবে না। মানুষ যদি মরে থাকে তো তাকে দাফন করতেই হবে। যেখানে ইচ্ছা করুক, এদিক দিয়ে শবযাত্রা করতে দেওয়া যায় না। কানুন নাই। চেয়ারম্যান এবার নিজেই এগিয়ে আসে। ভয়, দ্বিধা এবং সঙ্কোচে তার শোক প্রায় মুছে যায়। বাঙলা উর্দু এবং ইংরেজি মিশিয়ে সে জানায় যে রাত্রি পৌনে চারটায় তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তাদের বাড়িতে কান্না কাটির আওয়াজ পেয়ে স্কুলদালান থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে তলব করেছিলো। সব শুনে ক্যাপ্টেন সাহেব আদেশ দিয়েছেন যে যতো তাড়াতাড়ি পারে লাশ যেন দাফন করা হয়। তারই হুকুমে এরা এতো তাড়াতাড়ি এসেছে।এমন কি তাদের আত্মীয় স্বজন অনেকে এসে পৌঁছেনি। মোবারক আলি তাড়াতাড়ি যোগকরে, 'উনার বেটিও আসতে পারেনি।' কিন্তু মেয়ের ব্যাপারটা জানাতে চেয়ারম্যানের সায় নাই। সে শুধু মিনতি করে যে তারা যদি মেহেরবানি করে— । — না অনুমতি দেওয়া যায় না। সৈন্যরা তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে নিজেদের মধ্যে পা মেলাতে মেলাতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের বারান্দায় গিয়ে উঠলো। শবযাত্রীরা কি করবে বুঝতে পারে না। ওদিকে সৈন্যদের ২ জন বন্দুক তাক করে রেখেছে এদের দিকে, এক পা সামনে বাড়ালেই সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। প্রায় ১০/১৫ মিনিটি পর ২ জন সেপাই ফের আসে, জিগ্যেস করে 'লড়কা? জওয়ান লড়কা? উমর কেতনা?' ঈমাম-কাম-মোয়াজ্জেন বলে, 'জ্বি হাঁ হুজুর। আঠারো বয়স কা নওজোওয়ান!' ২ জন সৈন্যের ১ জন হাসে,অপরজন গম্ভীর মুখে যুবকের মৃত্যুর কারণ জানতে চায়। মোবারক শাজাহানের জ্বরের কথা বলে শেষ করতে না করতে সৈন্য ফের বলে, 'সালা মুক্তি থা? গোলি খাকে খতম হুয়া?' পেছন থেকে কাবেজউদ্দিন কি বোঝে সে-ই জানে, কেবল বিড়বিড় করে,'তাহ'লে কামই হলোনি!'

চেয়ারম্যানের ছোট ভাই আস্তে করে তাকে ধমক দেয়, 'চুপ কর!' এবং একই সঙ্গে ঈমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সৈন্যদের সন্দেহের প্রতিবাদে ব্যতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'নেহি হুজুর। বহুত আচ্ছা লড়কা থা।' সৈন্য ২ জন তেতো হাসি ছোড়ে। চেয়ারম্যান একটু এগিয়ে ফের জানায় যে সকালবেলা ক্যাপ্টেন সাহেব নিজে তাকে অনুমতি দিয়েছে, এখন তারা যদি মেহেরবানি করে তাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখাটুকু করিয়ে দেয় তো বড়ো উপকার হতো। এবার ২ জন সেপাই একসঙ্গে রাগ করে এবং ২ জনের রাগ ১ জনের গলায় প্রকাশিত হয় দ্বিগুন ঝাঁঝের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন কি তাদের মতো জানোয়ার যে ইচ্ছা করলো আর তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো? ক্যাপ্টেন কি তার বাবার চাকর যে এত্তেলো দিলেই চলে আসবে?

এদিকে লাশ কাঁধে করে কতোক্ষণ দাড়িয়ে থাকা যায়! কিছুক্ষণ পরপর শবযাত্রীরা খাটিয়ার নিচে ঘাড় বদল করে। হঠাৎ খুব গুমোট শুরু হওয়ায় সবাই ঘামতে শুরু করেছে, কেউ কেউ ভাবছে এর চেয়ে রোদ ভালো। পাশের নিচু জমি থেকে পানি সরে যাচ্ছে, কিন্তু পচা ঘাসপাতা ও কাদার জমাট বাঁধা গন্ধ বাতাসের একেকটি ঝাপটায় ভালোরকম জানান দিয়ে যায়। এর মধ্যে একজন সেপাই চেয়ারম্যানকে ডেকে নরম গলায় বলে যে এভাবে অপেক্ষা করে তাদের ফায়দা হবে না। যেখানে পারে তারা লাশ পুঁতে ফেলুক। চেয়ারম্যান রাজি হয় না। লোকটি তখন বিরক্ত হয়ে বলে, ঠিক আছে, তাহলে তার কিছু করার নেই। তবে এখানকার লোকদের তো হিন্দুদের সঙ্গেই আঁতাতটা বেশি এবং তারা এক রকম হিন্দুই বলা চলে তখন ছেলের লাশ সে পুড়িয়ে ফেললেই পারে। সেনাবাহিনী দেশলাই সরবরাহ করতে প্রস্তুত। চেয়ারম্যান কাঁদো কাঁদো মুখে শবযাত্রীদের কাছে আসে। কি করা যায়? শরৎকালের ফাজিল মেঘ থেকে এমন সময় পেচ্ছাবের মতো ছর ছর করে বৃষ্টি শুরু হয়। চেয়ারম্যান বলে, 'চলো চলো, বাড়ি চলো।' কিন্তু লাশ নিয়ে একবার বাড়ি থেকে বেরুলে আর ফেরা যায় না। সুতরাং মুশকিল হলো। ডান দিকে নিচু জমিতে কোনো বড়ো গাছ নাই। বাঁদিকের জমিও নিচু, তবে রাস্তার ঢালে ১টা শ্যাওড়া গাছ। শ্যাওড়াগাছের নিচে তেমন আড়াল হবে না, তার ওপর ঐ গাছে ভূতপেত্নীর আড্ডা, তারা আবার সব হিন্দু। কিন্তু আর কোনো উপায় না থাকায় খাটিয়া নামাতে হলো ওখানেই। চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই কোত্থেকে চাটাই নিয়ে এসে লাশের ওপর বিছিয়ে দেয়, কিন্তু তার আগেই শবযাত্রীদের কারো হাতের ছাতা নিয়ে লাশের শিওরে তাই ধরে বসে পড়েছে কাবেজউদ্দিন। বৃষ্টি থেমে যায় এবং দেখতে দেখতে মেঘ ও গুমোট কেটে রোদ উঠলো। রোদও ভয়ানক চড়া। মোবারকের কানের কাছে মুখ দিয়ে কাবেজউদ্দিন বলে, 'শালার ওদের তেজ কি! ওদপানি সবই গেলো চ্যাঙড়ার শরীলের ওপর দিয়া! কন তো, কি গজব পড়িছে, কন তো বাপু!'

জ্যান্ত মানুষের শরীরেও রোদপানির তেজ কম লাগে না। মোবারক আলির পায়ের একজিমা টাটায়, সেখানে একটু চুলকে নিলে হতো। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সাহেব তাকে একটু তফাতে নিয়ে ফিসফিস করে নতুন প্রস্তাব দেয়। লাশ নিয়ে পেছনে হটে চেয়ারম্যানদের বাড়ির দক্ষিণে বড়ো দীঘির উঁচু পাড় দিয়ে কিছুদূর হেঁটে তারপর নিচে জমির আল দিয়ে

গোরস্থানে যাওয়া যায়। — মোবারক একটু ভাবে। — হ্যাঁ, তা যাওয়া যায় বটে, কিন্তু নিচু জমি থেকে পানি এখনো সম্পূর্ণ সরে যায়নি। লাশ নিয়ে কি ঐ জমিতে যাওয়া যাবে? — কষ্ট একটু হবে, তবে জমিতে পা দেওয়া দরকার কি? আল দিয়ে দিয়েই তো দিব্যি হাটা চলে। — কিন্তু সদর রাস্তা ছেড়ে পেছন দিক দিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার কথা চেয়ারম্যানকে বলা যায় কি করে?

মাথার ওপর রোদ গর্জায়। এবার আর ভ্যাপসা নয়, রোদের একেকটা শিখা শিকের মতো খুলিতে বেঁধে। ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব আরেকজন শবযাত্রীকে ডেকে তার প্রস্তাব বুঝিয়ে বলে। মোবারক আলির মুখে প্রস্তাবটা শুনে চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই মন্তব্য করে না। তবে তার সায় বোঝা যায়।

জুম্মার নামাজের সময় হলে ইমাম সাহেব জুম্মার ঘরে চলে যায়। যাবার সময় চেয়ারম্যানের হাত ধরে ডাকলো। এই ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েবকে চেয়ারম্যান তেমন পাত্তা দেয় না। কিন্তু আজ কি করতে হবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলে চেয়ারম্যান সুড়সুড় করে তার সঙ্গে চললো। এমনকি শবযাত্রীদের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে সে ভুলে যায়। চেয়ারম্যানকে অনুসরণ করা মোবারক আলির কর্তব্য।

জুম্মার ঘর একেবারে ভরে বারান্দায় পর্যন্ত মুসলিদের ভীড়। গোলমাল শুরু হবার পর থেকে মানুষের নামাজ পড়া খুব বেড়ে গেছে। তার ওপর আজ জুম্মার নামাজ। জুম্মার নামাজের পর এখানে কতো কথাবার্তা হয়, কিন্তু আজ সবাই চুপচাপ। মোবারক আলি নামাজে উপযুক্ত মনোনিবেশ করতে পারে না। নিরাকার আলার জায়গায় তার চোখ জুড়ে ঝাঁঝরা-বুক বুলুর চিৎ-হয়ে-থাকা লাশ। বুলুর চুল ধুয়ে যাচ্ছে খালের পানি। তার শরীর বড়ো ক্লান্ত, দেখে মনে হয় দিনমান ছেলেটা খেটে এসে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে! ওকে ডিস্টার্ব না করাই ভালো । ঘুমাক। নামাজের পরও ছেলেটা ওর চোখ— ছাড়া হয়না। তা থাক না। ওর জন্য মোবারক আলির কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

শ্যাওড়াতলায় ফিরে গিয়ে দ্যাখা যায় চেয়ারম্যানের ভাই আলিম আখন্দ মিলিটারির সঙ্গে কথা বলছে। এই সেপাই নতুন, দুপুরের পর ওদের ডিউটি বদল হয়। শবযাত্রীদের সংখ্যা খানিকটা কমে গেছে। যারা নামাজ পড়তে গিয়েছিলো তাদের অনেকেই বাড়ি গেছে খাওয়া-দাওয়া সারতে। আবার তারা নামাজ পড়তে গেলে এখান থেকে কেউ কেউ কেটে পড়েছে। নাকি প্রথম থেকেই একটু একটু করে সরছে, মোবারক আলি হয়তো খেয়াল করেনি।

'না যাবার দিবার লয়!' লাশের মাথায় ছাতা ধরে বসে কাবেজ এখনো বিড়বিড় করেই চলেছে। এবার সবাই তার দিকে তাকায়। মানুষজন কমে যাওয়ায় কাবেজকে এমনিতেই চোখ পড়ছে। আপন মনে বিড়বিড় করা তার এক মুহূর্তের জন্য থামেনি। চাষাভুষা না হলে তার ঠোঁট নাড়ানোকে কলেমা পাঠ বলে মনে হতো। একটু স্বর বাড়ায় কাবেজ, 'যি মিলিটারি হুকুম দিবি, তাঁই বলে কড়িতলাত গেছে। চ্যাঙড়াপ্যাঙড়া কড়িতলার থানা বলে খাম করিচ্ছে।'

'আস্তে।' চেয়ারম্যান তাকে ধমক দেয়, 'শালা বলদের বাচ্চা বলদ। চুপ কর!'

আলিম আখন্দ বলে যে ক্যাপ্টেন এখানে নাই। সকালবেলাতেই তাকে যেতে হয়েছে কড়িতলা। সেখানে যে কি হয়েছে আলিম আখন্দ ঠিক বলতে পারে না, তবে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে। — চেয়ারম্যানের ধমক খেয়ে কাবেজউদ্দিনের বিড়বিড় ধ্বনি ফের খাদে নেমে এসেছে। কাবেজ কি বলছে? — না, চেয়ারম্যান তখন যদি বুলুর সঙ্গে শাজাহানকে যেতে দেয় তো শাজাহানের এই পরিণতি হয় না। আজ সে ব্যস্ত থাকতো কড়িতলা থানা বিজয় অভিযানে। শাজাহান তখন সঙ্গে গেলে বুলু কি তাকে না নিয়ে কড়িতলায় আসে। — বুলুর খবর তাহলে কাবেজ জানে না। মোবারক আলির মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছটফট করে। মিলিটারির জিপ উল্টিয়ে ২/৪/১০টাকে খতম করে বুলু কিভাবে মরল— এর বিস্তারিত চলচ্চিত্র তার করোটির ছাদের ভিতর দিয়ে গলিয়ে টাকরা গড়িয়ে পড়ে শুকনা জিভের খসখসে জমিতে, জিপ সুড়সুড় করে। দাঁত দিয়ে মোবারক আলি নিজের জিভ চুলকায়।

আবার ওঠো, খাটিয়া তোলো, ঘুরে দাঁড়াও, আখন্দ বাড়ির পেছন দিয়ে ঘুরে চলো গোরস্থানে। চেয়ারম্যানের বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড় পেরোবার সময় বাড়ির মেয়েদের কান্না নতুন করে চড়ে। তাদের শোককে পরিচর্যা করার সময় শবযাত্রীদের নাই। দেরী হয়ে গেছে,অনেক দেরী হয়েছে, তাড়াতাড়ি দাফন করা দরকার। মেয়েদের দিকে দেখতে দেখতে কাবেজউদ্দিন বিড়বিড় করা অব্যাহত রাখে, 'আম্মারা সব এখন কান্দিচ্ছেন? বুলুর সাথে তখন যাবার দিলেন না?

তখন বার হয়া গেলে চ্যাঙড়াটাক এতো জুলুম সওয়া লাগে?' বলতে বলতে শবযাত্রার সঙ্গে পা চালিয়ে কাবেজ বাঁশঝাড় পেরিয়ে উঠে পড়ে জোড়-পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপর।

পুকুরের পাড় আসলে একটা রাস্তার অংশ, এই রাস্তায় হাঁটতে শবযাত্রীদের কোনো অসুবিধা হয় না। এমন কি সরু ও কাঁচা পথটি থেকে নিচে নামাটাও স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়। জমিতে নামবার ঢালে পানি সরে গেছে। নিচের জমিতে আমন ধান। ভালো করে দেখলে মনে হয় ধানের সবুজ শীষ বাতাসে একবার ফুলে ওঠে, একবার বসে যায়। জমিতে এখনো ইঞ্চি দেড়েক পানি। ৮/১০ দিন আগে পানি ছিলো $\frac{১}{২}$ হাত, বর্ষা শেষ হয়ে গেলে কমতে কমতে ১$\frac{১}{২}$ নমেছে। কিন্তু এই ১$\frac{১}{২}$ পানি সরতে সপ্তাহের পুরোটাই লাগবে।

লাশের খাটিয়া যাদের ঘাড়ে তাদের একটি সারি যাচ্ছে জমির আলের ওপর দিয়ে, আরেকটি সারিকে হাঁটতে হয় ধানজমির ওপর । মোবারক আলির কাঁধে খাটিয়ার ডান দিকের প্রথম কোণ। তার আগে আগে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব। ঐ সারির শেষ কোণ আলিম আখন্দের ঘাড়ে। তার পেছনে চেয়ারম্যান। তারপর চেয়ারম্যানের চাচাতো ভাই। এদের পেছনে লম্বা সারিতে অন্য সবাই। আর ওদিকে পাশের পঙক্তিতে খাটিয়ার প্রথম কোণ বহন করছে কাবেজউদ্দিন। তার আগে আগে চলছে চেয়ারম্যানের সবচেয়ে বড়ো বর্গাচাষী বিটলুর বাপ ও তার ছেলে বিটলু, বিটলুর কোলে তার আড়াই বছর বয়সের ন্যাংটা শিশু। ঐ সারিতে খাটিয়ার পেছনের কোণ কাঁধে নিয়েছে গুণাহারের আরজ আলি সাকিদার, এ লোকটি চেয়ারম্যানের ধানকলের কর্মচারী, তার সামনে খাটিয়ার নিচে হেঁটে যায় আরজ আলির ভাইপো, এই সারির সর্বশেষ ব্যক্তি হলো নিহত শুকলু পরামানিকের ছেলে ওবায়েদ। এই সারিতে আর কেউ নেই। ধানজমিতে হাঁটা এখন রীতিমতো কঠিন কাজ। ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে খালি জায়গায় পা পড়লে ডুবে যায় কাদার মধ্যে। লালমাটির কাদা, এমনভাবে খামচে ধরে যে পা তুলতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এই সারির এরা মাঠে মাঠে কাজ করে বলে, মাঠ ওদের বেশ পোষা, মাঠের নাড়ি নক্ষত্র এদের মুখস্ত। ধান গাছের গোড়ার ওপর এমন করে পা ফেলবে যে একটুখানি হেলে ধানগাছ অনেকটা পাপোষের কাজ করবে। কাদার কামড় থেকে এইভাবে বাঁচতে হয়। আবার দেখতে হয় যেন একেবারে চিরকালের মতো শুয়ে না পড়ে। অতো দ্যাখাদেখির দরকার পড়ে না, তাদের পায়ের সঙ্গে মাঠ ও কাদার বোঝাপড়া ভালো, সহজে কেউ কাউকে ঘাঁটায় না।

সতর্ক পা ফেলতে হয় জমির আলের উপর দিয়ে যারা চলছে তাদের। জমির আল মাত্রেই সঙ্গে দিন দিন রোগা হয়ে আসছে, এর ওপর এতো দিন বর্ষার পানির নিচে থাকায় কোথাও কোথাও ক্ষয় হয়েছে। আলের ওপর তাই হাঁটতে হয় পা টিপে টিপে। আলিম আখন্দ মাঝে মাঝে উপদেশ দিচ্ছে, 'সাবোধান, খুব সাবোধান! দেখাশুন্যা কদম ফালাও। কাদার মধ্যে পড়লে বিপদ হবি!' সবাইকে সাবধান করার দায়িত্ব পালনে মগ্ন হয়ে লোকটা নিজের বাত-চুম্বিত চরণ-যুগলের প্রতি অবহেলা করে। কয়েকগজ মাত্র চলার পর ৭ম কি ৮ম সাবধান বাণী সম্পূর্ণ নিঃসৃত হবার আগেই তার মোটাসোটা ডান পা আল থেকে পড়ে যায় নিচে। খাটিয়ার ওপর শাজাহানের লাশ অনেকটা ডান দিকে গড়ায়। মোবারক আলির বুকে ধড়াস করে আওয়াজ ওঠে: লাশ কাদার মধ্যে পড়ে গেলো! তবে আলিম আখন্দের পায়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবার মতো সেও খাটিয়ার কোণ এবং খাটিয়ার পা দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলে। এইভাবে শাজাহানকে পতন থেকে উদ্ধার করা হয়। আলিম আখন্দের পা পড়েছিলো একটি ধান গাছের গোড়ায়, তাই রক্ষা। তবু বেচারার পায়ের পাতায় শামুকের খোলা লেগেছে, একটু রক্তও বোধহয় বেরিয়েছে। কিন্তু খাটিয়া বহনের কাজ থেকে রেহাই দেওয়া বড়ো সহজ কাজ নয়। কারণ জমির আলের সারির কারো পক্ষে কাউকে পেরিয়ে সামনে যাওয়া কঠিন, এরকম যেতে হলে তাকে আল থেকে নেমে কাদার ওপর দিয়ে যেতে হবে। যাক, আলিম আখন্দ সামলে নিয়েছে, অন্যদের সাবধান করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে সে এখন সতর্ক পায়ে হাটছে। জমিতে খসখস শব্দ। মাঝে মাঝে পানির ওপর পা পড়লে পানি ও ধান গাছের আওয়াজ। আর আলের ওপর দিয়ে যারা চলছে তাদের পায়ের নিচে শব্দ একঘেয়ে। তবে এই সারির পুরোভাহে ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব অবিরাম কলেমা পড়ে চলেছে, ফলে আলের ওপরেও বৈচিত্র্য আছ বৈকি! মোবারক আলির ভয় হয় যে কলেমা পাঠে ইমাম সায়েবের অখন্ড মনোযোগ নিজের কদমের প্রতি তাকে অসতর্ক না করে। এই ভয় ভালো করে দানা বাঁধতে না বাঁধতে ঘাড়ের ওপর খাটিয়া কেঁপে ওঠে, মোবারক আলির কাঁধ থেকে খাটিয়ার কোণ বলতে গেলে একটু সরেও যায় এবং সে চোখ বন্ধ করে দাড়িয়ে পড়ে। তার বন্ধ চোখের ভেতরটা পর্দার

মতো কাঁপে এবং মোবারক আলি দ্যাখে যে শাজাহানের লাশ ধান ক্ষেতে মুখ থবড়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে থাকে বুলুর মুখ। কোথায় কোন বৌডোবা খালের ধারে বুলুর লাশ পানিতে ভেজে। না, বুলু ছিলো চিৎ হয়ে। তার বন্ধ চোখের মণি তাগ করা ছিলো আকাশের দিকে। মিলিটারি জিপ উল্টিয়ে দিয়ে, ২/৪/১০ টা মিলিটারিকে খতম করে বুলুর তখন যা তেজ তাতে চোখের পাতা টাতা ভেদ করে সে সব দেখতে পাচ্ছিলো।— এদৃশ্যটি মোবারক আলি আগেই দ্যাখে এবং এটা দেখতে দেখতে তার বাম পা হড়কে পড়ে যায় জমির কাদায়। আবার এও হতে পারে যে তার পা নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাজাহানের লাশের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে এবং এই দৃশ্যটি দেখতে থাকে।

কাদা থেকে পা তুলতে মোবারক আলিকে একটু বেগ পেতে হয়। তার একজিমায় কাদাপানি লাগায় জায়গাটা বড়ো চুলকাচ্ছে। এখন সেখানে আর হাত লাগায় কি করে? কিন্তু চোখের বন্ধ পাতা ভেদ করে তাকানো বুলুর চোখ জোড়া ঝেড়ে ফেলা দরকার, নইলে ফের পা হড়কাবার সম্ভাবনা। আবার ওদিকে একজিমার যন্ত্রণা। সেটাও ভোলা দরকার। অস্থির হয়ে মোবারক একটু জোরে পা চালাবার চেষ্টা করতেই কাবেজ ও আলিম আখন্দ এক সঙ্গে চিৎকার করে, 'আস্তে আস্তে।' এবার মোবারকের পদস্খলন ঘটে না বটে, কিন্তু সে ধাক্কা খায় ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েবের পিঠে। সামনে জমির আল হঠাৎ খুব সরু হয়ে গেছে, ইমাম সায়েব সেজন্য প্রস্তুত ছিলো, কিন্তু মোবারকের ধাক্কায় তার সমস্ত প্রস্তুতি ভণ্ডুল হয়ে গেলো, আলের দুই পাশে কাদায় তার দুই পা গেঁথে যাওয়ায় লোকটার গতি একেবারে রুদ্ধ হয়। মনে হয় শাদা কাপড়ে জড়ানো ১ জোড়া খুঁটি পুঁতে তাকে স্থাপন করা হয়েছে। এখন কেবল তার মুণ্ডুতে চাঁদ-তারা-খচিত নিশান কোনোভাবে একটা ফিট করে দিলেই ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন সায়েব পত পত আওয়াজে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করবে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে বমির মতো তোড়ে বেরিয়ে আস, 'শালা জালেমের বাচ্চারা!'

বিটলুর বাপ এদিকে এসে আলের ওপর বসে ইমাম সায়েবের চরণ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে। এই জায়গায় কাদা বড়ো থকথকে। এক পা তুলতে গেলে শরীরের ভার পড়ে অন্য পায়ে এবং দ্বিতীয় পাটি কাদায় অনেক বেশি করে গেঁথে যায়। তার পেছনে লাশ ঘাড়ে নিয়ে এতোগুলো মানুষ অধীর আগ্রহের সঙ্গে বিটলুর বাপের প্রচেষ্টায় অগ্রগতি লক্ষ করে। ইমাম-কাম মোয়াজ্জেন সকলের লক্ষবস্তু হয়ে বিব্রত হয়। দিনে ৫ বার অবশ্য অনেক অনেক লোকের সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়। তবে সেটা হলো মেলা দিনের অভ্যাসের ব্যাপার। আর সেখানে তার নিজের কিছুই করার নেই। মুসলিরা কাতার বেঁধে দাঁড়ালেই সে ইঞ্জিনের ঠেলায় চলতে থাকা রেলগাড়ির মতো চাপ অনুভব করে এবং ১টির পর ১টি সুরা আবৃত্তি করে চলে। কিন্তু এখানে দৃশ্য বা অদৃশ্য কোন চাপ নাই যে তার ওপর ভরসা করে পেছনের লোকদের উৎকণ্ঠাকে সে অগ্রাহ্য করে। সারির সামনে ইমাম সায়েব অচল বলে সবার গতি রুদ্ধ, দায়টা কি তবে তার ওপরেই বর্তায় না? ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেন প্রায় আজান দেওয়ার মতো আওয়াজ তুলে আলার কাছে নালিশ করে, 'আলা পরওয়ারদিগার, তুমি দ্যাখো মুসলমানের মুর্দার সাথে এরা কিরকম নাফরমানি করে, মুসলমানের মুর্দার দাফন দিতেও এরা বাধা দেয়, আলা ,এরা কাফেরেরও অধম, জানোয়ার, সব হায়ওয়ান!' আলার উদ্দেশ্যে বললেও তার প্রকৃত লক্ষ শবযাত্রীরা এই আপাতঅভিযোগকে কৈফিয়ত বলে সনাক্ত করতে পারে এবং মেনেও নেয়। তবে এরকম না করলেও তার চলতো, কাদার ভেতর তার পা গেঁথে যাওয়ায় তার ওপর কেউ বিরক্ত হয়নি। এমনকি বিটলুর বাপ, যে কি-না গতবারের আগের বার চাষের সময় সার কেনার অর্ধেক টাকা যোগাড় করতে ইমাম সায়েবের কাছ থেকে ৪ মাসের কড়ারে ৫০ টাকা হাওলাত নিয়ে ৭ মাস পার করিয়ে দেওয়ায় ঐ কটা মাসের জন্য দ্বিগুন হারে সুদ দিলেও কেবল একবেলা খোরাকিতে তার পাতকুয়া সাফ করে রক্ষা পেয়েছিলো, সে পর্যন্ত তার পদসেবায় এতোটুকু ফাঁকি দিলোনা।

'কন তো ইমাম সায়েব, আমার ব্যাটার সাথে অরা ইটা কি করিচ্ছে, কন তো।' চেয়ারম্যানের এই বিলাপে সবাই চুপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে চেয়ারম্যান জানতে চায় তার নিরীহ নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চাটির ওপর আলার গজব নামে কেন? লেখাপড়ার বাইরে সে তো কিছুই জানেনা, কোথাও কোনো ঝগড়া-ঝাটির আভাস পেলে সে সেখান থেকে শতহাত দূরে থাকে।— তো তার ওপর এরকম জুলুম কেন— ? কেউ এর জবাব না দিলে গুনাহারের আরজ আলি সাকিদার জোর গলায় মনিবকে সমর্থন জানায়, 'কিসের ক্যাম্প খাড়া করছে, তার সামনে দিয় যাবার দিবি না।— ক্যান? — মুর্দা কি কাফনের মধ্যে বন্দুক লিয়া যাচ্ছে? মুর্দার হাতে হাতিয়ার আছে?'

'তালে তো কামই হতো।' জমির ওপর থেকে খাটিয়া কাঁধে জবাব দেয় কাবেজ, তার বিড়বিড় এতোক্ষণে বাক্যের আকার পায়, 'বন্দুক কি কচ্ছেন গো, মানুষের হাতে পান্টি দেখলে শালারা বলে গোয়ার কাপড় তুল্যা কোটে দৌড় মারবি

তার দিশা পায় না, কড়িতলাত গেলে দ্যাখা গেলোনি, সেটি বলে দুধের ছোলেরা এই জাউরাগুলাক খাম কর্যা ছিলো—
'

'প্যাচাল পাড়িস না কাবেজ! শালার চাষার মুখ বন্ধ হয় না।' আলিম আখন্দের ধমকে কাবেজ থামে, কিন্তু ইমাম-কাম মোয়াজ্জেনের চরণ— উদ্ধারের পর তার বিড়বিড় ফের শুরু হয়। শবযাত্রীরা কলেমা শাহাদত পড়ে , আর কাবেজ হলো জাহেল মানুষ, খোদার কালাম জানে না, সে কেবল জপে যে বুলুর সঙ্গে তখন শাজাহান যদি চলে যায় তো আজ কি তার এতো কষ্ট হয়? — কাবেজের জপপাঠ শোনে আর মোবারক আলির ঠোটজোড়া নিসপিস করে, বুলুর কথাটা কাবেজকে জানানো খুব দরকার।— বুকে গুলি লেগে বুলু মারা গেছে। না, এমনি মার খেয়ে মরে নি, মরার আগে হাত দিয়ে বোমা ছুঁড়ে মোটর ভর্তি মিলিটারি নিশ্চিহ্ন করে তাদের গাড়িগুলি সব উল্টিয়ে তারপর— তারপর বুকে, নাকি পেটে? না, বুকেই গুলি লাগলে বুলু গড়িয়ে পড়ে বৌডোবা খালে, বৌডোবা খাল কোথায়? — আরে পুবে যমুনা থেকে পশ্চিমে। তা এতোদিনে বৌডোবা খালে সে কি আর আছে? সে কি বসে থাকার ছেলে? বর্ষার ঢলে বুলুর লাশ ঠিক পৌঁছে গেছে যমুনার স্রোতে। যমুনার স্রোতের কথা খিয়ার অঞ্চলের মানুষ কাবেজ জানবে কোত্থেকে?— যমুনার একেকটা ছোবলে ঘরবাড়ি, ফসলের জমি, হাটবাজার, গ্রামকে গ্রাম,এমনকি গুনাহারের প্রদ্যোৎনারায়ণ হাই স্কুলের মতো দালানও টুপ করে ধ্বসে পড়ে, কোনো চিহ্ন থাকে না। তো সেই স্রোতের ওপরে সওয়ার হয়ে তার বুলু রওয়ানা দিয়েছে কোন দিকে? কোথায়? যমুনা গিয়ে মেশে কোথায়? পদ্মায়? না-কি মেঘনায়? তারপর আত্রাই পেরোতে হবে না? তারপর গুনাহরের কাপড়ের দোকানদারের বাড়ির পাশের নদী ধলেশ্বরী, সেটা কোথায়? মোবারক আলি সুরমা নদীর নাম জানে, করতোয়া তো তার চাচাতো বোন, স্কুলে তাদের ইতিহাসের মাষ্টার ছিলো, বাড়ি তিতাস নদীর তীরে, কোথায় যেন ভৈরব, কোথায় শীতলক্ষ্যা— এতোসব নদীর নাম মনে করতে করতে মোবারক হাবুডুবু খায়, থই পায় না। নদী উপনদীর বিপুল স্রোতধারা তার কানে এমন বেগে আছাড় খায় যে এমনকি বুলুর মায়ের কান্নাও চাপা পড়ে। এই বিশাল জলধারায় তার রোগা ঢ্যাংঙা কালো ছেলেটার গুলিতে ঝাঝরা বুক কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। এই গুমোট গরমে সিন্দুকের মতো গর্তে মাটিচাপা হয়ে থাকতে হচ্ছে না বলে বুলু তার ইচ্ছামতো হাতপা ছড়াতে পারে। সে কি চিৎ হয়ে শোয়? না-কি উপুড় হয়ে? বুলু কি ভেসে চলে? না-কি রুই,কাতলা, বোয়াল, চিতল, খলসে,পুঁটির ঝাঁকের সঙ্গে পানির নিচে এগিয়ে যায়? কিন্তু এতোসব প্রশ্নের জবাব খুজে বার করা মোবারকের পক্ষে বেশ কঠিন। সময়ও হয় না। গোরস্থানে পৌঁছে খাটিয়া নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে খেজুর তলার ধ্বসে পড়া এক কবরের ভেতর থেকে মোটাসোটা ১টা শেয়াল সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। মাটির ঢিল হাতে নিয়ে তাকে তাগ করে মোবারক খুব জোরে ছুঁড়ে মারে!

ফেরার সময় কয়েকজনের সঙ্গে মোবারক আলিও চেয়ারম্যানের বাড়িতে কিছুক্ষণ বসলো। মাইল তিনেক তফাৎ কড়িতলায় আজ খুব একচোট হয়ে গেছে, মিলিটারিও নাকি বেশ কয়েকটা সাফ।— খবর শুনে চেয়ারম্যানের পুত্র-শোক মাথায় ওঠার দশা, এই ক্যাম্পে মিলিটারির ক্যাপ্টেনকে না হলেও ১০ বার সে বলেছে এই ইউনিয়ন সম্পূর্ণ পবিত্র, ঐসব মুক্তি ফুক্তির ছোঁড়ারা অন্তত রেললাইন পেরুতে পারবে না, — এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। যে মুকুন্দহাটের গ্রামভর্তি হিন্দুরা গোলমালের শুরুতেই বর্ডার পার হয়েছে, এখন গোটা এলাকায় সাচ্চা মুসলমান ছাড়া আর মানুষ নাই।— এখন মিলিটারি এসে তার হাল কি করবে তা জানে কেবল আলা পরওয়ারদিগার আর মিলিটারি আর খানিকটা অনুমান করতে পারে সে নিজে। বাড়ির লোকজনও জান ভরে কাঁদতে পাচ্ছে না, কেবল শাজাহানের মায়ের কান্নার ক্লান্ত ও বসা গলার কান্না মধ্যরাত্রির কুকুরের ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার মতো টানা আওয়াজ তুলে অশুভ ইংগিত দিয়ে চলেছে। কড়িতলার শোধ নিতে মিলিটারি এই গ্রামে কতোরকম কায়দায় মানুষ-খুনের কেরামতি দ্যাখাবে তাই নিয়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে আতঙ্ক বিনিময় করে। পশ্চিম পাড়া মক্তবের কয়েকটি তালেব এলেম শাজাহানের ঘরে, ঐ ঘরের বারান্দায় এবং উঠানে যে যে জায়গায় শাজাহানের লাশ ছিলো, — বসে কোরান শরিফ পড়ছে। আগরবাতির ধোঁয়ার পাতলা পর্দার আড়ালে এদের মিনমিনে ঝাপসা আওয়াজ শুনে কে বলবে এরা আলা পাকের কালাম পড়ছে, না আগে ভাগে নিজেরাই নিজেদের জানাযা পড়ে নিচ্ছে, — মিলিটারির হাতে মরলে জানাজা হয় কি-না কে জানে? এদের সঙ্গে মোবারক আলি কথা বলে কি করে?

চেয়ারম্যানের বাড়ির বাইরের উঠানে কেবল কাবেজউদ্দিন। চেয়ারম্যানের গোরুবাছুর নিয়ে সে যাচ্ছে গোয়ালঘরের দিকে। বুলুর কথা শোনাবার জন্য তাকে দাঁড়াতে বলে মোবারক ফ্যাসাদে পড়ে, কথাটা শুরু করে কিভাবে? তা কাবেজউদ্দিনই তাকে উদ্ধার করে, 'দ্যাখেন তো চাচামিয়া, অলেয্য কথাটা হামি কি কনু, কন তো? তখন বুলুর সাথে

গেলে শাজাহানের আজ বলে এতো দুক্ষু পোয়ান লাগে? শালারা অর সাথে এতো জুলুম করব্যার পারে?' হঠাৎ গলা নামিয়ে সে জিগ্যেস করে, কড়িতলাত কি বুলু আসিছিলো, সোম্বাদ পাছেন?' আজ বুলু বেঁচে থাকলে কড়িতলার আক্রমণ হয়তো তারই পরিচালনায় সম্পন্ন হতো, কে জানে? কিন্তু বুলু মরার আগে যে কান্ডটা করে গেছে,— সেটা? কাবোজর নিচু স্বরকে পরোয়া না করে মোবারক স্বাভাবিক গলায় বলে, 'কাবেজ,বুলুর খবর তুমি কি জানো? অর লাশ লিয়া শয়তানি করবি এই ইবলিশের পয়দা মিলিটারি? বুলুর লাশ বলে বৌডোবা খাল থেক্যা বার হয়া— ।

'লাশ? বুলুর লাশ? কি কচ্ছেন চাচামিয়া'?

মোবারক আলি তখন বৌডোবা খালের ধারে পাটক্ষেতের ভেতর থেকে বুলুর গ্রেনেড ছুঁড়ে মিলিটারি মারার গল্প বলে। মস্ত বড়ো গাড়ি ভর্তি মিলিটারি খতম করার পর ওদের এক গুলিতে বুলু গড়িয়ে পড়েছে খালে। বুলুর লাশের দীর্ঘ জলযাত্রাপর্যন্ত পৌঁছবার আগেই গোরুর পালের পাটকিলে বাছুরটা দৌড় দেয় সামনের খড়ের গাদার দিকে, কাবেজ ছোট তার পিছনে। একটুখানি দাঁড়িয়ে মোবারক রাস্তায় নামলো।

রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। কেবল খুব জোরে পা চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে বিটলুর বাপ। তার ধ্যাবড়া পায়ের একেকটি কদমে রাস্তার নির্জনতা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মোবারক হঠাৎ করে তার সামনে এসে দাঁড়ালে সে চমকে ওঠে। মোবারক বলে, 'এখনি বাড়িত যাস?'

'কড়িতলার সোম্বাদ শুনেছেন? যাই। আত হয়া যাবি। ঘাটাত যদি ধরে তো— ।'

'কেটা ধরবি?'

'বেলা ডুবলে অরা ধরবি না?' এই বারবেলায় মিলিটারির নাম মুখে আনতে বিটলুর বাপের বুক টিপটিপ করে, ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে ক্যাম্প হাওয়ার পর থেকে সন্ধ্যা থেকে এখানে অঘোষিত কার্ফ্যু জারি হয়।

'আরে থো,' মোবারক প্রায় ধমক দেয়, 'হামার বুলু বলে একো বন্দুকের গুলিত মটোর ভরা মিলিটারিক শ্যাষ করিছে সেই বিত্তান্ত জানিস?'

'কি কন?' বুলু ইন্ডিয়া গেছে এই নিয়ে সে কানাঘুসা শুনেছে, তা ঐ বোকাসোকা কাবেজের কথায় আমল দেয় কে? 'তাই তো, বুলুক অনেকদিন দেখি না। হামি কই তার কলেজ আছে, তাঁই বগুড়া থিকা আসবার পারিচ্ছে না।' বিটলুর বাপ স্থির হয়ে দাঁড়ালে মোবারক বুলুর কথা বলে। তবে বলতে বলতে সে একটু আনমনা হয়ে যাচ্ছিলো, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা চাপা আওয়াজে তার বুক হুহু করে, আহারে, বুলুর মা আজ চোখ ভরে, গলা ভরে, বুক ভরে কাঁদবো! এই সুযোগটা দেওয়ায় শাজাহানের জন্যে একটু বেশিরকম মায়া হয়, কিন্তু বুলুর গল্প বলার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলো; গাছপালা, ঘরবাড়ি, ফসলের জমি এবং বাতাসের ওপর দিয়ে ভেসে আসা সেই আওয়াজে হাওয়া লাগে, খুব বেগে তা এগিয়ে এলে দুজনই দক্ষিণে তাকিয়ে তার উৎস খুঁজতে থাকে। দেখতে দেখতে কড়িতলার মাইল খানেক দক্ষিণে রেললাইনের ওপরের অনেকটা জায়গা আগুনে, ধোঁয়ায়, চিৎকারে আর্তনাদে সামনে এগিয়ে আসে। বিটলুর বাপ ফিসফিস করে, 'মনে হয় আইলগর। অরা গেছে!' 'হু, মিলিটারি পড়িছে। রায়নগর মোকামতলা ঘোড়াঘাটের একটা পোকাও অরা রাখবি না, দেখিস। কুত্তার বাচ্চারা মানুষ সহ্য করবার পারে না।' মোবারক আলির গলা কাপে।

'বাড়িতে যাই ভাইজান, অনেকক্ষণ বেলা ডুবিছে, যাই।' পা বাড়িয়ে বিটলুর বাপ এগোয় না, বলে, 'তা ভাইজান, বুলু যখন বোমা না বন্দুক মারলো ঐ মোটরের মধ্যে ওরা কয়জন আছিলো? ব্যামাক কয়টায় মরিছে?'

'তো তোমাক কলাম কি?'

বিটলুর বাপ হন হন করে হাঁটা দিলে ঝপ করে রাত নামলো, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ থেকে আলোর সঙ্গে অন্ধকার চোঁয়ায় প্রায় সমান সমান। আসমত সরকারের আমবাগানের পশ্চিম মাথায় ভাঙাচোরা, কেবল ১০/১২টি ইটসর্বস্ব শাহবাবার মাজারশরীফের শিয়রে মস্ত শিমুল গাছের নিচে বিড়ি টানতে টানতে রাতভোর বসে থাকে ভিখুপাগলা, ঐ গাছের পুরনো বাসিন্দা শাহবাবার পোষা জিনের কাছে সে গুপ্তবিদ্যার পাঠ নিচ্ছে আজ কম করে হলেও ৭ বছর তো হবেই। ভিখুপাগলাটাও আজ নাই, মনে হয় কড়িতলা রায়নগরের খবর তারও কানে গেছে। মোবারক একটু দমে গেলো, ভিখুপাগলাকে বুলুর গল্প বললে তার থ্রুতে আসমানি জীবের এলাকায় বুলুর গল্পটা ঠিক পৌঁছে যাবে। তবে একটু এগোলে এই ক্ষোভ মুছে যায়, জুম্মাঘরের অন্ধকার বারান্দায় বসে ইমাম-কাম মোয়াজ্জিন বদনা থেকে পানি ঢেলে অজু করছে।

ইমাম সায়েবের কুলকুচো করার আওয়াজ আজ এতোটাই খাদে নেমেছে যে মনে হতে পারে লোকটা সবাইকে লুকিয়ে চুপচাপ কোনো নিষিদ্ধ পানীয়তে চুমুক দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে তাই আবার নীরবে বমি করে ফেলছে। মোবারকের অবশ্য তা মনে হয় না। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে সে আজকের কড়িতলা সংঘর্ষের বিবরণ ছাড়ে। তার বর্ণনা থেকে খুঁটিনাটি জিনিসও বাদ পড়েনা, কড়িতলায় আশেপাশে কোনো খাল না থাকায় মিলিটারির গাড়ি চুরমার হয়ে পড়ে যায় প্রাইমারি স্কুলের মাঠে। এখানে পাটখেত নাই, তাই রোগা ঢ্যাঙা কালো ছেলেরা বোমা ছুঁড়েছিলো স্কুলের উত্তরে বাঁশঝাড় থেকে। মিলিটারি যতোগুলো গিয়েছিলো প্রাণ নিয়ে কেউ ফেরে নি। ছেলেদের মধ্যে থেকে গেছে একজন, হ্যাঁ প্রথম বোমাটি সেই ছুঁড়েছিলো। তারপর ফ্ল্যাশ ব্যাক করে মোবারক বুলুর গল্প করে। সবই বলে, এমন কি তার যমুনায় পৌছে যাওয়ার খবরটিও বাদ পড়ে না। মিলিটারি সম্বন্ধে সে বাঞ্চোৎ, বেজন্মা, বেশ্যার পয়দা, জাউরা, হারামির বাচ্চা ও হারামখোর এইসব বিশেষণ প্রয়োগ করলে অজু নষ্ট হতে পারে জেনেও ইমাম সায়েব লালচে কালো ধানখেতের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত তার কথা শোনে।

ওদিকে বুলুর মা দাঁড়িয়েছিলো দরজার কপাট ধরে। গ্রামে মিলিটারির ক্যাম্প পড়ার পর থেকে বুলুর বাপ বেলা থাকতে থাকতে ঘরে ফেরে, মগরবের নামাজ সে আজকাল ঘরেই পড়ে। আর আজ কি-না এশার আজান পর্যন্ত পড়ে গেলো, তার দ্যাখ্যাই নাই ।

ভেতরের বরান্দায় জলচৌকির ওপর গামছা ও বদনা ভরা পানি দিয়ে বুলুর মা রাগ করে, 'দেরি হলে খবর পাঠাবার পারো না? একটা মানুষ পাই না যে তোমার কথা পুস করি।'

তার জন্য স্ত্রীর এই দুশ্চিন্তা দেখে মোবারক আলি বিরক্ত। যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয় নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কিভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন্ দুঃখে?

◆ ◆

বস্তুসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বগুড়া জেলার একটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলীর কলেজ-পড়ুয়া ছেলে সুলতান ওরফে বুলু যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়। বুলুর জন্য পুত্রশোকাতুরা মা কাঁদতে পারে না, কারণ বাড়ির খুব কাছেই ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে বসেছে পাক মিলিটারিদের ক্যাম্প। এক রাত্রে কান্নার একটানা শব্দে মোবারক আলীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। গ্রাম পাহারা দিয়ে এসে মিলিটারি উচ্চকণ্ঠ কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কী জবাব দেবে, এই ভয়াকুল চিন্তায় বিমূঢ় মোবারক আলী একসময় বুঝতে পারে এ কান্না তার পুত্রশোকাতুর স্ত্রীর কান্না নয়; কান্নার শব্দটি মূলত আসছে পার্শ্ববর্তী চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে। মোবারক আলী নিশ্চিত হয় এ-কান্না চেয়ারম্যানের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া। চেয়ারম্যানের মেধাবী ছেলে শাজাহান ছিলো মোবারকের পুত্র বুলুর স্কুল জীবনের সহপাঠী। টাইফয়েডে আক্রান্ত শাজাহান যুদ্ধ কালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় ঐ রাতে। মিলিটারিদের সঙ্গে চেয়ারম্যানের সম্পর্ক যদিও খারাপ ছিলো না, তবু পুত্রের চিকিৎসার জন্য তাদের সাহায্য নিতে দ্বিধা ছিলো চেয়ারম্যানের। কারণ— 'ঘরে সোমত্ত বয়সের মেয়ে আছে, কিসের বিনিময়ে কি চেয়ে বসে।'

চেয়ারম্যানের ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে বুলুর মায়ের পুত্রশোক উথলে ওঠে। শঙ্কিত মোবারক স্ত্রীকে শান্ত হওয়ায় জন্য ধমক দেয় এভাবে, 'কেন ছেলেকে আগলে রাখতে পারোনি, এখন হায় হায় করে লাভ কি?' কিন্তু বুলুর মায়ের দুঃখটি ভিন্ন রকমের। শাজাহান অন্তত বাপ-মায়ের সামনে মরেছে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তার মা প্রাণভরে ছেলের মুখ দেখে নিতে পেরেছে। কিন্তু তার বুলু কোথায় কার গুলি খেয়ে বিরান প্রান্তরে মুখ থুবরে পড়ে গেল, 'অপঘাত' মৃত্যু হলো কেন তার ছেলের? মোবারক আলিও ছেলের মৃত্যুকে অপঘাত মৃত্যু হিসেবেই ধরে নিয়েছে। এতে অন্তত মুক্তিযোদ্ধা ছেলের কীর্তির পরিচয়টি গোপন থাকবে এবং সম্ভাব্য বিপদকেও এড়ানো যাবে। এসব এলোমেলো ভাবনার সূত্রে মোবারক-দম্পিতর মনে হয় প্রতিবেশী চেয়ারম্যান তাদের তুলনায় ভাগ্যবান, কেননা তাদের ছেলের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

ভোরের আলো ফুটলে মোবারক চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়ে জানতে পারে, মৃত্যুর পূর্বে রোগ বিকারগ্রস্থ শাজাহান সারারাত ধরে বন্ধু বুলুর কথা বলেছে, বুলুর সঙ্গে চলে যাবার কথা বলেছে। মৃত্যুর পূর্বে বিকারাবস্থায় বুলুর জন্য শাজাহানের ব্যাকুলতা বুলুর মৃত্যুকে নতুন মূল্যে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে মোবারককে।

বুলু যুদ্ধে যাবার চারমাস পর একটি ছেলে বুলুর খবর নিয়ে এসেছিলো মোবারকের কাছে। ছেলেটি জানিয়েছিল, বুলুসহ ওরা তিনজন পাকসেনাদের গতি রোধ করার জন্য বৌ-ডোবা খালের ব্রিজের নিচে মাইন পুঁততে গিয়েছিলো। কেননা ব্রিজের এপাশে দেবডাঙায় তখন মুক্তিবাহিনীর সমাবেশ ঘটে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর নিরাপত্তার স্বার্থেই ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিলো। তারা যখন ব্রিজের নিচে মাইন পোঁতার কাজ শুরু করেছে ঠিক তখনই ওপাশ থেকে এগিয়ে আসা মিলিটারি জীপের আওয়াজ পেয়ে তারা দ্রুত পাটক্ষেতে লুকোয়। জীপ ব্রিজে উঠতেই বুলু পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে জীপকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে। লক্ষ্যভেদের সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের পাশে বসা অফিসার ছিটকে ব্রিজ ডিঙিয়ে নিচে পড়ে যায়। জীপগাড়ি গড়াতে গড়াতে আটকে পড়ে খালের মুখে। কিন্তু ওদের অলক্ষ্যে একজন পাকসৈনিক আগেই জীপ থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো। মিলিটারিদের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রগুলো সংগ্রহ করতে বুলু ও তার একজন সহযোদ্ধা জীপের কাছে যাবার জন্যে রাস্তায় উঠে আসতেই ঐ সৈনিকটি গুলি ছুড়লে দুটি গুলি ঝাঁঝরা করে দেয় বুলুর বুক; ঘটনাস্থলেই শহীদ হন বুলু। শাজাহানের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে বুলুর মৃত্যুর ঘটনা স্মরণ করে মোবারক আপুত হয়ে ওঠে, বুলুর আত্মবলিদানকে নতুন মূল্যে গ্রহণ করে সে।

মিলিটারি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন চেয়ারম্যানকে ডেকে নিয়ে শাজাহানের লাশ দ্রুত দাফনের নির্দেশ দেয়। ক্যাম্পের সামনে দিয়ে লাশ নিয়ে গোরস্থানে যেতে বাধা দেয় কর্তব্যরত সেপাইরা। শরতের প্রারম্ভের ঘটনা হলেও বর্ষার জল তখনো সরে যায়নি মাঠঘাট থেকে। অন্যকোন রাস্তা ধরে গোরস্থানে যাবার পথও তাই বন্ধ। এরকম একটি অস্বস্তিকর পরিবেশে অশিক্ষিত কৃষক কাবেজ বলে যে চেয়ারম্যান যদি শাজাহানকে বুলুর সঙ্গে যেতে দিত তাহলে তাকে ছেলের লাশ নিয়ে এমন বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না। সে এখন থাকতো মুক্তিসেনাদের কড়িতল থানা বিজয়-অভিযানে। মোবারক ভাবে কাবেজ জানে না যে, মিলিটারি জীপে গ্রেনেড ছুড়ে কতগুলো মিলিটারিকে খতম করে বুলুর আত্মবলিদানের কথা। বুলুর মৃত্যুর ঘটনা কাবেজকে বলতে ইচ্ছে করে মোবারকের। অনেক কষ্টে জল-কাদা ডিঙিয়ে শাজাহানের লাশ দাফনের পর চেয়ারম্যান বাড়ির উঠোনে কাবেজ মোবারককে বলে, 'দ্যাখেন তো চাচা মিয়া, অলেয্য কথাটা হামি কি কনু কনতো? তখন বুলুর সাথে গেলে শাজাহানের আজ বলে এত দুক্ষু পোয়ান লাগে? শালারা অর সাথে এত জুলুম করব্যার পারে?' শেষে গলা নামিয়ে কাবেজ মোবারকের কাছে জানতে চায় বুলু কড়িতলা অভিযানে এসেছিলো কি না। এবারে মোবারক আর নিজেকে আটকে রাখতে পারে না, কাবেজের নিচু স্বরকে উপেক্ষা করে স্বাভাবিক গলাতেই ছেলের বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুর কাহিনী শুনিয়ে দেয় সে কাবেজকে। সন্ধ্যায় জুম্মা ঘরের বারান্দায় ইমাম-কাম-মোয়াজ্জেনকে প্রথমে বানিয়ে বানিয়ে কড়িতলা সংঘর্ষের গল্প বলে মোবারক, শেষে শোনায় ছেলে বুলুর প্রকৃত বীরত্বের কাহিনী।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও বাড়ি ফিরতে দেরী দেখে বুলুর মা ভয়ে আতঙ্কে প্রতীক্ষা করে মোবারকের। স্ত্রীর ওই দুশ্চিন্তা দেখে পুত্রগৌরবে গৌরবিত মোবারক বিরক্ত বোধ করে। তার মনে হয় 'যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েকও হয়নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কিভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?'

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. রাতে একটানা কান্নার শব্দ শুনে মোবারকের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো?
২. সেপাই সাহেবের সম্ভাব্য প্রশ্নের কী উত্তর ভেবে রেখেছিলেন মোবারক?
৩. শাজাহানের চিকিৎসা-সহায়তা না-পাওয়ার কারণ কী?
৪. 'রাত্রিবেলা এ ঘরের ভূগোল মোবারকের মুখস্থ।' — কোন্ প্রসঙ্গে এই মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে?
৫. মোবারকের ভাবনার অনুসরণে টর্চার সেলের বর্ণনা দিন।
৬. মিলিটারি ক্যাম্প বসার পর গ্রামীণ জনজীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন।
৭. বুলুর মৃত্যু সংবাদ বহন করে আনার ঘটনাটি বর্ণনা করুন।

৮. বুলুর মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করুন।
৯. মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বুলুর প্রসঙ্গে কী অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো চেয়ারম্যান?
১০. শাজাহানের মরদেহ দাফনের সময় কী ঘটনা ঘটেছিলো?

৪ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ
শহীদ পুত্রের স্মৃতিভারাক্রান্ত মোবারক আলির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে প্রশ্নোক্ত উদ্ধৃতিতে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলির ছেলে বুলু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হয়েছে। কলেজে পড়ুয়া বুলু যুদ্ধের শুরুতেই নিজের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এক পর্যায়ে বাবা-মাকে না বলে বুলু যুদ্ধে অংশ নিতে চলে যায়। বুলু এরপর আর মা-বাবার কাছে ফিরে আসেনি। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুসেনাকে হত্যা করে শেষে বুক চিতিয়ে জীবনোৎসর্গ করেছে সে। চার মাস আগে ঘর পালানো ছেলের খবর মাত্র দেড়মাস আগে জানতে পারে মোবারক। বুলুরই এক সহযোদ্ধার কাছ থেকে মোবারক জানতে পেরেছে যে বৌডোবা খালের ব্রিজের নিচে মাইন পুঁততে গিয়ে মিলিটারি জীপের অতর্কিত আগমনে বুলুকে আকস্মিকভাবেই গ্রেনেড নিক্ষেপ করতে হয়। নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডে মৃত্যু ঘটে অনেক মিলিটারির। কিন্তু পূর্ব-সতর্ক একজন পাক-সেপাইর নিক্ষিপ্ত দুটি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় বুলুর বুক। বুলুর এই আত্মবলিদানের সংবাদ নিজের এবং গ্রামবাসীর জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে মনে করেই মোবারক গ্রামের গ্রামে আস্তানা গাড়া মিলিটারি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন — সাহেবের সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে পুত্রের অপঘাত মৃত্যু হয়েছে বলে মনে মনে জবাব ঠিক করে রাখে।

মোবারকের স্ত্রী বুলুর গর্ভধারিণীর অনন্ত জিজ্ঞাসা — তার বুলুর ওপর কেন গজব নামলো, অপঘাতে মৃত্যু হলো কেন তার প্রিয় পুত্রের। বুলুর মা গুমরে গুমরে কাঁদে। কিন্তু কান্নার ওপরও রয়েছে বিধি-নিষেধ। পুত্রহারা মায়ের গগনবিদারী হাহাকার দেড়শ গজ দূরে স্থাপিত মিলিটারি ক্যাম্পের সেপাইদের প্রশ্নমুখী করে তুলবে। জেরার ফাঁপরে নড়ে বিব্রত হবে মোবারক হয়ত এতে উন্মোচিত হয়ে যাবে গোপন খবর। এ জন্যেই পুত্রহারা শহীদ-জননীর অবাধ কান্না অনুমোদন করে না মোবারক।

বুলুর ঘরেই নাতিকে নিয়ে কয়েকদিন ধরে শয়ন করছে বুলুর মা। গভীর রাতে একটানা কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় মোবারকের। বুলুর মায়ের প্রতি বিরক্ত হয় সে। তবে শেষে সে বুঝতে পারে এ কান্নায় শব্দ আসছে দক্ষিণ দিকের চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে। মোবারক নিশ্চিত হয় যে টাইফয়েডে আক্রান্ত চেয়ারম্যানের একমাত্র পুত্র শাজাহানের মৃত্যুরই প্রতিক্রিয়া এ কান্না। মোবারক বিছানা থেকে নেমে পাশের কামরায় প্রবেশ করে যেখানে নাতিকে নিয়ে বুলুর মা শুয়ে রয়েছে। বুলুর মারও চোখে ঘুম ছিলো না তখন, সে বলে ওঠে, 'আস্তে হাঁটো, টেবিলের উপরে দুধের বোতল, কাঁচের গিলাস'। কিন্তু মোবারককে এ সব বলার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা রাত্রিবেলাও প্রিয় পুত্রের এ— ঘরের ভূগোল তার মুখস্থ। মাত্র দুরাত ধরে বুলুর মা নাতিকে নিয়ে এই ঘরে শয়ন করছে। কিন্তু প্রতি রাতেই প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে মোবারক একবার করে এই ঘরে এসে অল্পক্ষণের জন্য বসে। তার জানা আছে কোথায় বুলুর তক্তপোষ, কোথায় তার কেরোসিনকাঠের টেবিল। বুলুর পড়ার টেবিলে পুরনো ক্যালেন্ডারের মলাট লাগানো বই খাতা, দোয়াত, কলম, কিভাবে সাজানো সব মোবারকের জানা। পুত্রের মৃত্যু বেদনাকে সঙ্গোপনে বুকে ধারণ করে শহীদ-পিতার প্রতিদিনকার মধ্য রাত্রি স্মৃতিযাত্রায় অতিবাহিত হয় এভাবেই।

৯ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা- উত্তরঃ
জেলা সদর বগুড়ার কলেজে পড়ুয়া ছেলে বুলু মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে বাড়ি ফিরে সম্ভাব্য যুদ্ধের উত্তেজনায় মেতে ওঠে। রাস্তায় হাটে-বাজারে তখন শুধু মিছিলের পর মিছিল। নতুন অভিজ্ঞতার স্পর্শে উজ্জীবিত গ্রামীণ জনতা তখন উত্তেজনায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। বুক চিতিয়ে এক-একজন মানুষ হেঁটে বেড়ায়। মনে হয় যেন এক মানুষের গায়ে দশ মানুষের বল। বুলুল তখন খাওয়া-নাওয়া নেই, ঘুরে বেড়ায় এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম। জোয়ান ছেলেদের নিয়ে প্যারেড করে, চাষাভুষা রাখালদের নিয়ে জগৎ জয় করার উন্মাদনায় মাতোয়ারা তখন সে। মার্চের শেষে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলো, শহরবাসী মানুষের ঢল নামলো গ্রামে। বগুড়া শহরের মানুষও আশ্রয়ের জন্য ছুটে এলো গ্রামে। এরকমই এক

পরিস্থিতিতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলিকে তার পুত্র বুলু সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলে — 'মোবারক মিয়া, বুলু এই গোলমালের মধ্যে যাচ্ছে, আপনি শাসন করিচ্ছেন না? আবার শাজাহানক খালি খালি চেতাচ্ছে, শাজাহান স্কলার ছাত্র, অর কি ইগলান করা মানায় কন?' চেয়ারম্যানের ধারণা মাথায় পোকা ঢুকেছে বলেই গাদাবন্দুক আর দা-কুড়াল নিয়ে মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধ করার নেশায় মেতেছে ছেলেরা। মুক্তিযুদ্ধে মধ্যপন্থী দ্বিধান্বিত মানুষের অবস্থান চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে চেয়ারম্যানের সংলাপে-মনোভাবে।

উৎস ও প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. চেয়ারম্যানের ভাগ্য! — তার ছেলেরই এমন স্বাভাবিক মরণ। এসব ভাগ্যের ব্যাপার!
২. অপঘাতত মরছে, তা তাঁই কি তোমার ব্যাটা লয়? পাষাণ বাপ হছো, ব্যাটা তোমার নিজের পয়দা লয়?
৩. শাজাহানের খালি চোখ অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছিলো বুলুর খোঁজে; তার শুধু এক কথা, বুলুকে ডাকো, আমি বুলুর সঙ্গে যাব।
৪. বুলুকেও ভালোভাবে দ্যাখা যায়, শাজাহানকেও দ্যাখ্যা যায়। বুলু এবং শাজাহান সম্পূর্ণ আলাদা ২ জন যুবক।

৩ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ

আলোচ্য গল্পাংশটুকু বাংলাসাহিত্যের অবিস্মরণীয় কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর 'অপঘাত' গল্প থেকে সংগৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বুলুর ও টাইফয়েড-আক্রান্ত শাজাহানের মৃত্যুপূর্বকালীন আক্ষেপ বন্ধু আকুতি প্রকাশিত হয়েছে।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের ছেলে শাজাহান এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলীর ছেলে বুলু স্কুল জীবনের সহপাঠি। মেধাবী শাজাহান এস.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকায় পড়তে যায় আর বুলু ভর্তি হয় জেলা সদর বগুড়ার একটি কলেজে। স্কুল পর্যায়ে এদের দুজনের বন্ধুত্ব তেমন ছিলো না। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ায় পর থেকেই মেধাবী শাজাহান আর সাহসী বুলুর মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য এবং পিতার রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই সম্ভবত শাজাহানের পক্ষে সময়ের প্রয়োজন মান্য করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয়নি। শাজাহানের অজানা ছিলো না যে, তারই বন্ধু বুলু মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। একদিন বাড়ির কাউকে না-বলেই বুলু স্বেচ্ছায় শান্ত মস্তিষ্কে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়া হয়েছিল। তার পিতা মোবারক আলী পরবর্তীকালে খবরটি জেনেছে এবং শেষাবধি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুসৈন্যদের হত্যা করে পুত্রের শহীদ হওয়ায় খবরটিও তার কাছে পৌঁছেছে। বুলুর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সংবাদটি অন্যদের অজানা থাকলেও, কলেজ-পড়ুয়া কৃতীছাত্র শাজাহানের কাছে সম্ভবত গোপন ছিলোনা । তরুণ মেধাবী শাজাহানও সঙ্গোপনে পালন করতো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। পরিস্থিতির শিকার হয়েই তাকে গৃহে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে এবং পরিণতিতে সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে রোগ-বিকারগ্রস্ত ঐ অবদমিত আকাঙ্ক্ষাই ব্যাখ্যেয় আকুতি ও আক্ষেপের মধ্য দিয়ে রূপলাভ করেছে। শাজাহানের মরদেহ দেখতে গিয়ে মোবারক আলী শাজাহানের বিলাপরত জননীর কণ্ঠে শুনেছে যে, সে মৃত্যুর পূর্বে একটি কথাই বার বার উচ্চারণ করেছে— 'খালি বুলু, খালি বুলু'। তামাম রাত খালি বুলুকে ডাকে, খালি বুলুকেই ডাকে। বুলুর সাথে চল্যা যামু , — বুলুকে কও আমাকে না লিয়া যেন যায় না। ওমা, বুলুক আটকাও, আমাকে ছাড়া উঁই গেলো।' শহীদ পুত্রের জনক মোবারক আলী, যে দেশের জন্য পুত্রের জীবন উৎসর্গ করার সংবাদ, এমনকি মক্তিযুদ্ধে তার অংশগ্রহণের তথ্যটি পর্যন্ত সযত্নে গোপন রেখেছে, তার অন্তরে সুতীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া তার অন্তরে সঞ্চার করে শক্তি। মোবারক আলির প্রবলভাবে জানতে ইচ্ছে করে শাজাহান তার পুত্র বুলুর সঙ্গে কী উদ্দেশ্যে কোথায় যেতে চেয়েছিলো। চেয়ারম্যানের বাড়িতে এসে জানতে পেরেছে মৃত্যুর পূর্বে শাজাহান মা-বাবা-ভাই-বোন কারো সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। এক ঢোক পানি খাবার জন্যেও এদিক-ওদিক তাকায় নি। একবারের জন্যেও মাকে মাথা টিপে দিতে বলেনি। মৃত্যু এলে মানুষ আজরাইলকে দেখে ভয়ে চোখ বড়ো করে ফেলে। কিন্তু শাজাহানের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা হয়নি। তার অস্থির চোখ শুধু খোঁজ করেছে বুলুকে; আর একই কথা বার বার উচ্চারণ করে বলেছে 'বুলু কে ডাকো', আমি বুলুর সঙ্গে যাবো।'

রোগবিকারগ্রস্ত শাজাহানের অবচেতন এই আকুতি ও আক্ষেপের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন তার অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষার স্ফূর্তি পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পুত্রের যুদ্ধযাত্রা ও আত্মবলিদান পিতা মোবারক আলির চিত্তে নতুন মূল্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

৪ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ

ব্যাখ্যেয় গল্পাংশটুকু কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'অপঘাত' গল্প থেকে সংগৃহীত । আলোচ্য অংশে পিতা মোবারক আলির দৃষ্টিকোণ থেকে শহীদ-পুত্র বুলু এবং তার সহপাঠী বন্ধু শাজাহানের মধ্যকার ব্যবধানকে গত্মকার অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলির ছেলে বুলু মা-বাবাকে না-জানিয়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। চারমাস আগে বুলু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ঘর ছাড়ে। এর আড়াই মাস পর পিতা মোবারক আলি জানতে পারে তার বীরপুত্র শত্রু সৈন্যদের হত্যা করে শেষে বুক চিতিয়ে কীভাবে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। পরিবার ও গ্রামের নিরাপত্তার স্বার্থেই মোবারক আলি অনেক কষ্ট সহ্য করেও গোপন রাখে শহীদ পুত্রের এই বীরত্ব কাহিনী। কিন্তু তারই পুত্র বুলুর সহপাঠী শাজাহান টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে এই স্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে নিজের পুত্রের মৃত্যু— যাকে সে সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে 'অপঘাত' বলাই শ্রেয় বলে ভেবেছে, তার তুলনা বিচারে মগ্ন হয়েছে। প্রথমে মোবারক আলির মনে হয়েছে যে, বুলুর অপঘাত মৃত্যুর তুলনায় শাজাহানের স্বাভাবিক মৃত্যু সহনীয় এবং সেই সূত্রে শাজাহানের পিতা ভাগ্যবান ব্যক্তি। কিন্তু মৃত্যুপূর্বকালে রোগ বিকারগ্রস্ত শাজাহান যে শুধু বুলুর কথা এবং বুলুর সঙ্গে চলে যাওয়ার কথা বলেছে, এ কথা শুনে মোবারক আলির চিত্তে পুত্রের যুদ্ধযাত্রা এবং আত্মবলিদান সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংকট অতিক্রম করে গৌরব রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ফলে মুক্তিযোদ্ধা শহীদ-পুত্রের সঙ্গে স্নেহাসক্ত গৃহকোণ বন্দী প্রতিবেশী-পুত্রের মধ্যকার পার্থক্যটুকু মোবারক আলির কাছে দ্বিধাহীন স্পষ্টতায় চিহ্নিত হয়েছে।

যুদ্ধের ময়দানে শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে বুক-চিতিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছে যে প্রিয়-পুত্র, শ্রুতি-সূত্রে তার সে মুখটি সু-অঙ্কিত মোবারক আলির হৃদয় পটে। ফলে রোগবিকারে অকালমৃত প্রতিবেশীর পুত্র শাজাহানের মরদেহ দেখতে এসে মোবারক আলির মনশ্চক্ষে বারবার ভেসে উঠেছে প্রিয় পুত্রের মুখ। সে মেনেছে শাজাহান মৃত্যুর পূর্বে বারবার বুলুর কথা বলেছে, বুলুর সঙ্গী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি ব্যক্ত করেছে। মোবারক আলি শাজাহানের মরদেহের দিকে তাকিয়ে বুলুকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ অবধি মোবারক এই প্রত্যয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে বুলু ও শাজাহান সম্পূর্ণ আলাদা দুই যুবক। শাজাহানের মরদেহ নিরীক্ষণ করে সে দেখে যে, তার বুকটি অক্ষত-অনাহত। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখে ভেসে উঠেছে বুক উঁচিয়ে মৃত্যুবরণকারী তার শহীদ পুত্রের গুলিতে ঝাঁঝরা রক্তাক্ত বুক। কাজেই শহীদ-মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত পিতার দৃষ্টিতে পুত্রের আত্মবলিদান মহামূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। মোবারক আলির এই উপলব্ধি হয় যে, দেশের জন্য যুদ্ধে গিয়ে যে ছেলে জীবন উৎসর্গ করেছে সে অনন্য, অতুলনীয়।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. 'অপঘাত' গল্প অবলম্বনে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।
২. 'অপঘাত' গল্পে ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. মোবারক আলি চরিত্রের তাৎপর্য বিশেষণ করুন।
৪. মোবারক আলি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বুলু ও শাজাহান চরিত্রের তুলনা করুন।

৪ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

মোবারক আলি বগুড়া জেলার একটি ইউনিয়ন কাউন্সিলের ছা-পোষা কেরানি। তার নিস্তরঙ্গ জীবনে অর্জিত অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ও গৌরবময় আত্মোপলব্ধিই 'অপঘাত' গল্পের মুখ্য বিষয়বস্তু। বিশিষ্ট কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অসামান্য দক্ষতায় সৃজন করেছেন মোবারক আলি নামের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অধীনস্থ কেরানি মোবারক আলি গ্রামজীবনে অভ্যস্ত হলেও এস.এস.সি উত্তীর্ণ ছেলে বুলুকে উচ্চশিক্ষার্থে জেলা সদরে পাঠাতে দ্বিধা করেনি। চেয়ারম্যানের মেধাবী পুত্র শাজাহান বুলুর সহপাঠী। নিজের পদ-মর্যাদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণেই চেয়ারম্যান তার পুত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্যে প্রেরণ করেছে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায়। স্কুল জীবনে বুলু ও শাজাহানের মধ্যে তেমন হৃদ্যতা না থাকলেও কলেজ জীবনে এরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে। ছুটিতে শাজাহান বাড়িতে এলে বুলুর খোঁজ করে। ছাত্র হিসেবে কৃতী না হলেও প্রত্যয়ী বুলুর মধ্যে রয়েছে অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তি। নিজের সামাজিক অবস্থান ও স্বাস্থ্যগত অসামর্থ্যের বিপরীতে বুলুর সম্ভাবনা দীপ্র সাহসী পদচারণা বুলুর প্রতি শাজাহানের আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠেছিলো। মুক্তিযুদ্ধকালে টাইফয়েডে আক্রান্ত গৃহবন্দী নিরুপায় শাজাহান মৃত্যুর পূর্বে তাই বারবার মুক্তিযোদ্ধা বুলুর নাম উচ্চারণ করেছে, জ্বরবিকারগ্রস্ত প্রলাপে বুলুর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছে।

মোবারক আলির সাহসী ছেলে বুলু মা-বাবার অনুমতি না নিয়েই গোপনে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। মার্চের শেষে ঢাকায় যখন গণহত্যা শুরু হয়েছে, সে সময়টাতে গ্রামে ফিরে এসে বুলু গ্রাম্য-জনতাকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। মিছিল-মিটিং আর প্যারেড করে মাতিয়ে তোলে গ্রাম্য জনপদ। অবশেষে একদিন গোপনে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে নিরুদ্দেশ হয় বুলু। তার নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার আড়াইমাস পর মোবারক আলি যুগপৎ পুত্রের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের এবং গেরিলাযুদ্ধে শত্রুসেনাদের হত্যা করে জীবন-উৎসর্গের সংবাদটি জানতে পারে। ছাপোষা কেরানি মোবারক আলি পারিবারিক ও গ্রামীণ জীবনের নিরপত্তার স্বার্থেই খবরটি সাধারণ্যে গোপন রাখে। নিজের বাড়ির দেড়শ গজ সীমার মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের দফতরে স্থাপন করা মিলিটারি ক্যাম্প নিস্তরঙ্গ গ্রাম-জীবনে মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে বিরাজ করছিলো। পুত্রহারা বুলুর মায়ের অহর্ণিশ একটানা কান্না, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় উদ্বেল করে তোলে মোবারক আলিকে। ক্যাম্পের ক্যাপ্টন সাহেবের সম্ভাব্য প্রশ্নের এক নিরাপদ উত্তর ঠিক করে রাখে মোবারক। যে পুত্রের শোকে তার স্ত্রী কাঁদে, সে পুত্র মৃত্যুবরণ করেছে অপঘাতে।

পুত্রের 'অপঘাত মৃত্যুর' এক নিরাপদ জবাব ঠিক করে রাখলেও প্রায়শ বিনিদ্র রাত অতিক্রম করতে হয় মোবারক আলিকে। পুত্রের শোবার ঘরের আসবাবপত্র এবং তার ব্যবহার্য শিক্ষা-উপকরণাদি কোথায় কীভাবে সাজানো আছে অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পায় মোবারক। প্রতিরাতেই একবার ছেলের ঘরটি ঘুরে যায় পুত্র-শোকাহত পিতা। বুলুর সহযোদ্ধা যে বন্ধুটি তার পুত্রের সংবাদ বহন করে এনেছিলো তাকেও ভুলতে পারে না মোবারক। বৌ-ডোবা খালের ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার মিশনে কীভাবে বুলু গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শত্রুসেনাদের হত্যা করে শেষে বুক চিতিয়ে জীবন-উৎসর্গ করেছিলো সেই শ্রুত ঘটনার প্রতিটি মুহূর্ত চলচ্চিত্রের মতো জীবন্ত হয়ে আছে মোবারক আলির অন্তরে। কিন্তু দেশকালের রূঢ় বাস্তবতা পুত্রের গৌরবগাথা সর্বসমক্ষে প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হওয়ায় পিতা মোবারক আলিকে এক অসহনীয় মানস- সংকটে বাস্তবতা হতে হয়। গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রাতের অন্ধকারে বিনিদ্র মোবারক আলির খন্ড-খন্ড ভাবনার উপস্থাপনায় তার অবরুদ্ধ আবেগ-গৌরবকে জীবন্ময় করে তুলেছেন।

পুত্রগৌরবিত মোবারক আলির অবরুদ্ধ আবেগ মুক্তিলাভ করেছে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান-এর পুত্র বুলুর সহপাঠী শাজাহানের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে। টাইফয়েডে আক্রান্ত শাজাহানের অকাল মৃত্যুতে সমব্যথী মোবারক চেয়ারম্যানের বাড়িতে গিয়ে জানতে পারে যে,শাজাহান মৃত্যুর পূর্বে কেবল বুলুর নাম ধরে ডেকেছে, বুলুর সঙ্গে চলে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। এই তথ্যসূত্রে বুলুর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও দেশের জন্য জীবনসমর্পণ-এর বিষয়টি মোবারক আলির কাছে নবমূল্যে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধার পার্থক্য। অমুক্তিযোদ্ধা শাজাহানের আক্ষেপ ও আকুতির তাৎপর্য অনুধাবন মাত্রই মোবারক আলি উত্তীর্ণ হয় এক গর্বিত শহীদ-পিতার মূর্তিতে। মোবারক উপলব্ধি করে যে বুলু ও শাজাহান অভিন্ন-বয়সী যুবক হলেও, দুজন আলাদা,স্বতন্ত্র। শাজাহানের অক্ষতবক্ষ মরদেহ দেখতে গিয়ে তার অন্তরে শ্রুতি-সূত্রে জীবন্ত বিদীর্ণ-বক্ষ পুত্রের ছবিটি ভেসে ওঠে। বুক চিতিয়ে দেশের জন্য আত্মবিসর্জন —— এক স্মরণীয় গৌরব। মোবারক আলির এই আত্মোপলব্ধিই তাকে এক গর্বিত শহীদ-পিতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। এজন্যেই মোবারক আলি শেষ অবধি পুত্রের যুদ্ধযাত্রা ও দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের প্রসঙ্গটিকে আর গোপন রাখে না —— পুত্রের গৌরবকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেও হয়ে ওঠে এক মুক্ত মানুষ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'অপঘাত' গল্পে এ-ভাবেই একজন দ্বিধাবিচলিত সীমাবদ্ধ পিতার আত্মমুক্তিকে মোবারক আলির চরিত্রে রূপান্বিত করতে সর্বাংশে সফল হয়েছেন।